সূর্যোদয়

আশাপূর্ণা দেবী

তিন সঙ্গী ॥ ৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট ॥ কলকাতা-৭৩

—দ্বিতীয় মুদ্রণ—

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৬৮
জানুয়ারী, ১৯৬১
প্রকাশিকা : রেবা গঙ্গোপাধ্যায়
ত্রিন সঙ্গী
৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩
মুদ্রক : শীতলচন্দ্র রায়
তারকেশ্বর প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন,
কলকাতা-৬
প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

স্নেহের

শ্রীমান ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত

ও

শ্রীমতী নূপুর গুপ্ত

আদরণীয়েষু—

পিসিমা

আমাদের প্রকাশিত এই লেখিকার
আরেকটি উপন্যাস
সুখের নিলয়

প্রস্তুতি চলছে অনেকক্ষণ থেকে।

আশ্চর্যসুন্দর মহান আবির্ভাবের প্রস্তুতি।

সারা পূব আকাশ জুড়ে সেই প্রস্তুতির সমারোহ।

শিল্পী বসেছেন রং-তুলি নিয়ে, চলছে তুলির টান একটার পর একটা। সেই টানে ফুটে ফুটে উঠছে—কী লাবণ্য, কী সুষমা!—রং একটাই, কিন্তু একটা রং থেকেই যে বর্ণ-বৈচিত্র্যের কত কারিগরি সম্ভব, এ যেন তারই নমুনার আসর।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লাগে, চমক লাগে, অন্তরালে অবস্থিত অদৃশ্য সেই মহান শিল্পীর পরম মহিমার কাছে মাথা নত হয়ে আসে।—নিত্য দেখা এই অপরূপ উদ্ভাসনের দৃশ্য চন্দ্রকান্তর মধ্যে যেন একটা ব্যাকুলতা এনে দেয়। বিরহের মত, বিচ্ছেদ বেদনার মত। পরম কোনো উপলব্ধির আনন্দ বুঝি বিষণ্ণ বেদনারই সমগোত্র।

তবু এই অনির্বচনীয় স্বাদটুকুর জন্য শেস রাত্রি থেকে আর ঘুম হয় না চন্দ্রকান্তর। ঘোর ঘোর অন্ধকার থাকতে বিছানা ছেড়ে উঠে হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে শুদ্ধ বস্ত্র পরে পূবের দালানের খোলা খিলানের সামনে পাতা জলচৌকিটায় এসে বসেন—আকাশের দিকে চোখ মেলে।

এ একটা নেশার মত চন্দ্রকান্তর।

চিরপুরাতনের এই নিত্যনতুন প্রকাশ, চন্দ্রকান্তর কাছে যেন এক অফুরন্ত বিস্ময়ের ডালি।

যেন প্রতিটি তিমির রাত্রির অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে চন্দ্রকান্তকে এই আশ্চর্য উপহারটি দেবার জন্যই তার ডালি সাজানো। ঋতুতে

ঋতুতে প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্য। তবে সব থেকে মনোরম বুঝি এই গ্রীষ্ম ঋতুর নির্মল ঊষার আকাশ। এ ঋতুতে রাত্রি শেষ না হতেই যবনিকা উত্তোলনের আভাস দেখা দেয়।

আকাশে বর্ণচ্ছটা, বাতাসে প্রাণকণা।

আর কোনো ঋতুতে এমন দীর্ঘস্থায়ী সমারোহ নেই আবির্ভাব উৎসবের। আর ক'দিন পরেই ঋতুর পালা বদল হবে, বর্ষা এসে পড়বে, পঞ্জিকার পাতায় তার ইশারা। সে সময় নিজেকে যেন বড় বঞ্চিত বঞ্চিত লাগে চন্দ্রকান্তর। এখন তাই লোভীর মত প্রথম থেকে শেষটুকু পর্যন্ত উপভোগ করে নেবার জন্যে উঠে এসে বসে থাকেন, অনুভূতির গভীরে গিয়ে।

অবশেষে রূপ থেকে অপরূপ, জ্যোতিঃ থেকে জ্যোতির্ময়। কোলের উপর জড়ো করে রাখা দুখানা হাত আপনিই জড়ো হয়ে যায়, আর বুঝি আপনিই উচ্চারিত হয়—

ওঁ জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং—

একটু পরে আস্তে পাশে রাখা গীতাখানা তুলে নিয়ে খুলে ধরেন পড়তে হয় না, সবই মুখস্থ, তবু নিত্য পাঠের নিয়ম রাখতে সাম খুলে ধরা। 'পেজমার্ক' হিসেবে আছে ছোট্ট একটু ময়ূরপুচ্ছ, চন্দ্রকা[illegible] বাবার আমলের। —বাবার পাঠ করা গীতা, বাবার হাতের 'পৃষ্ঠা চিহ্ন'। এটি চন্দ্রকান্ত তদবধিই পাঠের অভ্যাস করেছেন। পাঠ শেষে আবার সেটি নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে বই মুড়ে ফেলে মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করে চলেন—গীতা মে হৃদয়ং পার্থ. গীতা মে সারমুত্তমম্—

গীতামাহাত্ম্য! এও নিত্য পাঠের অঙ্গ।

হোলো তোমার ?

স্তব্ধতার সুর কেটে দিয়ে ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল এই আকস্মিক প্রশ্নের আঘাত। যেন নিস্তব্ধ দুপুরে দূরবর্তী ঘুঘুপাখির উদাস করুণ সুরের একটানা ছন্দের মাঝখানে উচ্চকিত হয়ে উঠল একটা চিলের কর্কশ ডাক।

চন্দ্রকান্ত চমকে ফিরে তাকালেন।

—অথচ চমকাবার কারণ ছিল না। আকস্মিক নয়, নির্দিষ্ট নিয়মের প্রশ্ন।—সুনয়নী এসে দাঁড়িয়েছেন শ্বেত পাথরের গেলাসে মিছরির পানা নিয়ে। এটাই চন্দ্রকান্তর সকালের পানীয়। এও তো প্রতিদিনই নতুন হয়ে দেখা দেয় পুষ্টি আর তুষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়ে, দেখা দেয় শুভ্র সুন্দর আধারে বাহিত হয়ে। তবু কী একঘেয়ে লাগল, কী অরুচিকর!

জিনিসটা একঘেয়ে? না, একঘেয়ে এই বহু-ব্যবহারে জীর্ণ প্রকাশ ভঙ্গীটা?

চন্দ্রকান্ত চট করে গেলাসটার জন্যে হাত বাড়ালেন না। সুনয়নীর দিকে তাকালেন একবার। সন্দেহ নেই, সদ্য স্নান করে এসেছেন সুনয়নী। কিন্তু পরনের তসর শাড়িটা মলিন বিবর্ণ লাট হয়ে যাওয়া, তেল-হলুদের হাত মোছার ছাপও সুস্পষ্ট।

দু' হাতে মোটা মোটা দু' গাছা কুমীর না হাঙর—কী যেন মুখো বালার সঙ্গে শাঁখের শাঁখা, বাঁ হাতে গোটা আষ্টেক নোয়া। ভিজে চুলের সিঁদুরের রেখাটা ভিজে ভিজে হয়ে কপালের উপর গড়িয়ে আসছে, আর সেই গড়িয়ে আসার ঠিক নীচেই গোলা সিঁদুরের চটচটে প্রকাণ্ড টিপটা নাকের উপর নেমে আসার তাল করছে।—শিরা প্রকট হয়ে ওঠা শীর্ণ মুখটায় এতো বড় টিপখানা যেন একটা অসঙ্গতি। সদ্য স্নাতা, কিন্তু সদ্য-স্নানের স্নিগ্ধ প্রশান্তি কই?

চন্দ্রকান্তর মনে হল, একদা সব সময় মনে হয়েছে 'সুনয়নী' নামটা কী সার্থক। ঘরে পরে বলেছেও সবাই সে-কথা। এখন আর ওর নামটা কারও মনেই পড়ে না। অবশ্য মনে পড়বার খুব কারণও নেই, নাম ধরে তো আর ডাকেন নি কখনো? স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর নাম উচ্চারণে শাস্ত্রীয় বাধা, পুরুষের পক্ষে তো তেমন কোনো বাধা নেই, তবু স্ত্রীকে কে কবে নাম ধরে ডাকে?—সেই যে একদা

ছোটবৌ নামের জামাটা গায়ে চড়িয়ে এ-সংসারে ঢুকেছিল 'সুনয়নী' নামের মেয়েটা, ওই জামার আড়ালে তার নিজস্ব পরিচয়টা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

নাও ধরো। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো হাঁ করে?

চন্দ্রকান্ত হঠাৎ গাম্ভীর্য ত্যাগ করে একটু হেসে বলেন, আমি যতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকবো।

ঢং। সুনয়নী ঠোঁটটা টিপে একটু ভুরুর ভঙ্গিমা করলেন।

ঢং কেন? দেখছিলামই তো হাঁ করে।

আচ্ছা খুব ন্যাকামি হয়েছে। নাও নাও—ছিষ্টির কাজ পড়ে।

চন্দ্রকান্ত হাত বাড়িয়ে গেলাশটা নিয়ে বলে উঠলেন, নেহাৎ কম ভোরে তো ওঠো না, ভোরের আকাশটা একটু দেখতে ইচ্ছে করে না?

সুনয়নী আবার ভ্রূভঙ্গী করলেন, কী দেখতে ইচ্ছে করে না?

ভোরবেলার পূব আকাশ। সূর্যোদয়ের দৃশ্য।

সূর্যি ওঠার দৃশ্য! সুনয়নী একটু ঝংকার দিলেন, খেয়ে-দেয়ে তো কাজ নেই আমার, তাই ভোরবেলা তোমার মতন আকাশ পানে হাঁ করে তাকিয়ে বসে থাকব! বলে ঘুম থেকে উঠে পর্যন্তই চর্কি-পাক!

আচ্ছা, এতো কি কাজ তোমাদের বলতে পারো?

চন্দ্রকান্ত গেলাসটা মুখে তুলতে গিয়েছিলেন, আবার নামিয়ে ধরে প্রায় হতাশ গলায় বলেন, এতোগুলি মেয়েছেলে তোমরা, সবাই শুনি সকাল থেকে চর্কি-পাক ঘোরো। সেই চর্কিটা কী?

কী? তাই এখন তোমায় বোঝাবো বসে? নাও নাও, খেয়ে নাও তো। গেলাসটা নিয়ে যাই। কোথায় নামিয়ে রাখবে, কে ঠোক্কর দেবে, হয়ে যাবে দফা গয়া।

পতিসেবার পুণ্যটি অর্জন করতে শখ, তার জন্যে একটু সময় দিতে রাজি নয়।

চন্দ্রকান্ত গেলাসটা খালি করে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, নীলকান্ত উঠেছে ?

এই এক শখ চন্দ্রকান্তর—ছেলের পুরো নামটা ধরে ডাকা।

কে নীলে ? সুনয়নী ঠোঁট উল্টে বলেন, সে নইলে আর এই সাতসকালে উঠবে কে ?

অন্যায়, খুব অন্যায় ! একটু পরেই তো পণ্ডিতমশাই এসে যাবেন।

পণ্ডিতও তেমনি, ও ওঠে না দেখে নিজেও দেরি করে আসেন।

আশ্চর্য ! বরং ঠিক সময় এসে ছাত্রকে লজ্জা দিয়ে শিক্ষা দেয়া উচিত।

সুনয়নী আর একবার ঠোঁট ওল্টান, হ্যাঁ, বিশ্বসুদ্ধু লোক যে তোমার মতন উচিতের পুঁথি হাতে নিয়ে বসে আছে।

গেলাসটা নিয়ে সুনয়নী চলে যান।

চন্দ্রকান্তর হঠাৎ মনে হয়, একদা সুনয়নীর ঠোঁটের গড়নটা কী সুকুমার ছিল ! একটা বিশ্রী মুদ্রাদোষের জন্যে গড়নটাই বদলে গেছে।

শুধুই কি চোখ আর ঠোঁট ?

মাথা থেকে পা অবধি সমস্ত গঠন-ভঙ্গিমাটাই কি ছিল না সুন্দর সুকুমার ? ছিল। বড় সুন্দরই ছিল।

বৌ দেখে চন্দ্রকান্তর ঠাকুমাকে সবাই ধন্যি ধন্যি করেছিল, নাতবৌ এনেছ বটে চন্দরের ঠাকুমা, যেন সরস্বতী প্রতিমাখানি।

হ্যাঁ, 'সরস্বতী প্রতিমাই' বলেছিলেন সবাই, বাজার চলতি 'লক্ষ্মী-প্রতিমা' কথাটি ব্যবহার করেন নি।

নতুন কনের শাঁখের মত শাদা রঙের সঙ্গে নিখুঁৎ কাটছাঁটের মুখ আর পাতলা ছিপছিপে গড়ন। সরস্বতীর তুলনাই মনে আনিয়ে দিয়েছিল দর্শকদের।

এই 'ধন্যি ধন্যি' পড়ে যাওয়ার ধ্বনিটা সদ্য তরুণ অথবা প্রায়-কিশোর বরের কাছে এসে পৌঁছেছিল বৈকি। বাড়ির পাকাচোকা ছোট মেয়েগুলোর মারফৎ। মুখরাপ্রখরা বৌদি-স্থানীয়দের মারফৎ। নইলে আর কীভাবে হবে? বিয়েবাড়িতে গিন্নীরা যেখানে মহোৎসাহে একসঙ্গে মসগুল, বিয়ের বর তো সেখানের ত্রিসীমায় নেই।

বিয়ের বহুবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যেকার নিজ ভূমিকাটুকু পালনের শেষেই তো বরের অন্তঃপুর-রঙ্গমঞ্চ হতে দ্রুত প্রস্থান।

তবু কানে এসে যাচ্ছে প্রায় সবই।

কম্পিত পুলকিত দুরু-দুরু বক্ষ বর গভীর হতাশার সঙ্গে ভেবেছে —আমায় কি আর একটু দেখতে দেবে? কী সব পুজোটুজো হয়ে গেলেই তো বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। লোকমুখে অবশ্য শুনেছে, বরকেও নাকি সেই সঙ্গে যেতে হয়, 'জোড়ে' না কি!···কিন্তু তাতে আর লাভটা কী হবে, ঘোমটাখোলা মুখটা তো আর দেখতে দেবে না কেউ।

বিয়ের রাত্রে 'শুভদৃষ্টি' নামের ব্যাপারটার সময় অবশ্য একটা সুযোগ হারিয়েছে। উপায় কী? সবাই মিলে বলেছিল, 'তাকাও তাকাও, তাকিয়ে দেখো। তাকা না তাকা একবার—তাকাতে হয়!···কিন্তু তাই আবার পারা যায় নাকি? মাথাখারাপ!

কনে কি করেছিল কে জানে, দু' হাতে একখানা আস্ত পানপাতা মুখে চাপা দিয়ে তো বসেছিল পিঁড়ি ঘোরাবার সময়। সে পান ফেলে দিয়ে 'সুনয়নযুগল' মেলে দেখেছিল কি! বর অন্তত তা জানে না। বর মুখও তোলেনি, চোখও খোলেনি।

কিন্তু নিজালয়ে এসে বৌয়ের রূপের প্রশংসা শুনতে শুনতে মনে হতে থাকল, আহা, তখন যদি একবার দেখে নিতাম।

'ফুলশয্যে' বলেও একটা ব্যাপার ছিল, কিন্তু তার পিছনে তো একটা গভীর ষড়যন্ত্রও ছিল। ক্ষুদে ভাগ্নী 'মেন্তি' চোখ মুখ ঘুরিয়ে চুপি চুপি একফাঁকে লাগিয়ে গিয়েছিল, 'জানো ছোটমামা, ওরা না

সব্বাই আড়ি পাতবে। তুমি যেন বোকার মত কনে মামীমার সঙ্গে কথা কয়ে বোসো না।'

অতএব সুযোগ জোটেনি।

কিন্তু পরে দেখা গেল, 'ওরা' অর্থাৎ কৌতূহলাক্রান্ত মহিলাকুল একেবারে অবিবেচক নয়। অষ্টমঙ্গলার আগের রাত্রে ওঁরা এমন একটি ঘরে বরকনের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন, যার কোনো-দিক থেকেই আড়ি পাতবার উপযুক্ত গলতি জায়গা নেই। তেমন দুর্দান্ত কৌতূহল থাকলে আমবাগানের দিকে বাঁশের ভারা বেঁধে উঠতে হবে অবশ্য এ-ব্যবস্থার বহিরঙ্গের দৃশ্যে এটাই প্রকাশ, বাড়িতে মেলাই অভ্যাগত তখনো মজুত, ঘরের অকুলান। অতএব কোণের দিকের ওই ছোট্ট ঘরটা ছোট্ট মানুষ দুটোর জন্যে বরাদ্দ হোক।

বড় ঘরে জোড়া পালঙ্ক ফুলশয্যা তো হয়ে গেছে।

পরেও কিন্তু জানলার সংখ্যায় দীন সেই ছোট্ট ঘরটাই অনেকদিন পর্যন্ত বাড়ির ছোট ছেলে-বৌয়ের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল।···তা প্রথম সেই ঘরটায় ঠাই পেয়ে বর যখন বাড়ির দিকে সবটাই চাপা দেখেছিল, তখন কৃতার্থ হয়ে বৌয়ের কাছাকাছি খাটের একধারে বসে অনেকক্ষণ ঘামার পর বুকে জোর নিয়ে বলে ফেলেছিল, একটু ছোঁব তোমায়?

এ-প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে কনের ঘোমটা সরে গিয়েছিল আর তার সুগঠিত সুকুমার ঠোঁটটা উল্টে গিয়েছিল। কিন্তু শুধুই কি উল্টে গিয়েছিল? সেই ঠোঁটজোড়া থেকে একটি তিনাক্ষরযুক্ত কথা বেরিয়ে আসেনি?···হ্যাঁ, স্পষ্টই শুনতে পেয়েছিল বর—

'মরণ।'

সেই প্রথম ছন্দপতন।

বাড়িতে ছোট মেয়ে অনেক আছে, তারাও কম পাকাটে নয়। হয়তো চন্দ্রকান্তর নিজের ভাগ্নী-ভাইঝিরাই এরকম শব্দ ব্যবহার

করে থাকে।···চন্দ্রকান্তর ছোটমাসির মেয়ে তো (কতই বা বয়েস তার, সুনয়নীর থেকে এমন কিছু না) কথায় কথায় বলে, 'গলায় দড়ি আমার।'

চন্দ্রকান্তর কানে এলেই কানে বাজে, কিন্তু এমন প্রাণে বাজেনি কোনোদিন।

মাসতুতো বোনকে তবু বকা যায়। বলা যায়, এই এমন গিন্নীদের মতন বিচ্ছিরি করে কথা বলিস কেন ?

কিন্তু এই সর্বালংকার-ভূষিতা সরস্বতী প্রতিমাকে কি বকা যায় ? শুধু নিজেই মলিন হওয়া যায় মাত্র।

ঘরে আলোর মধ্যে দেয়ালে-লাগানো একটা 'দেয়ালগিরি।' কেরোসিনের আলো, পলতে বাড়ালে দিব্যি আলোই হবে। কিন্তু পলতে কমানো ছিল। তাই একটা আবছা আবছা আলো। সেই আলোয় ওই মেয়েকে যেন পরীর দেশের রাণীর মত দেখতে লাগছে। বিগলিত 'চন্দর' বিচলিত চিত্তে ভাবে, এই মুখ থেকে অমন বিচ্ছিরি একটা কথা বেরোলো কী করে ?

তারপর ভাবল, গিন্নীদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে বোধহয়, তাতেই এই বিশ্রী অভ্যাস। সেরে যাবে। এ-বাড়িতেও যে গিন্নীদের সঙ্গেই ঘুরবে একথা তখন মনে পড়ল না।···

একটুক্ষণ পরে মনের মালনতা ঝেড়ে ফেলে বলল, আলোটা একটু বাড়িয়ে দেব ?

কেন ? আলো বাড়িয়ে কী সগ্‌গো লাভ হবে ?

যদিও এটাও ছন্দের আর ধাপ পতন, তবু ছেলেটা একটু সাহসী হয়ে উঠেছে। তাই বলে ফেলে—তোমায় একটু বেশী করে দেখব।

বলার পরক্ষণেই একটুকরো হাসি ছিটকে উঠল সেই ললিত লাবণ্যময় সুকুমার ঠোঁটটা থেকে।······

হাসিটার জাত কী, সেটা অনুধাবন করবার সময় নেই, হাসিটাই তো পরম প্রাপ্তি। কৃতার্থমন্য বর খাট থেকে নেমে পড়ে দেয়ালের

দিকে এগিয়ে যায় হাতটা বাড়িয়ে। কিন্তু সে তো মুহূর্তমাত্র।… আলোর দিকে বাড়ানো মনটা আর হাতটা ফিরে এল নিজের মধ্যে।

ওই হাসির টুকরোটার সঙ্গে যে একটা কথার টুকরোও ছিটকে উঠে ঢিলের মত এসে লাগল —সঙ না পাগল!

খাটের একধারে নিজের জন্যে নির্দিষ্ট বালিশটায় মাথা গুঁজে ছেলেটা সেই যে শুয়ে পড়ল কনের দিকে পিঠ করে, সারা রাত্তিরের মধ্যে আর নড়ল চড়ল না।

বেশ কিছুক্ষণ যাকে বলে অলংকার শিঞ্জিনী, তা কানে আসতে থাকল। অস্বস্তিও হতে থাকল। মনে হতে থাকল, এতো নড়ছে কেন? ছারপোকা কামড়াচ্ছে? কই আমায় তো কামড়াচ্ছে না!…আসলে অন্য বাড়ির বিছানায় ঘুম আসছে না, এরকম হয় অনেকের। কে জানে, ওদের বাড়ির বিছানা হয়তো বেশী নরম।…কে জানে, মায়ের কাছে শোওয়া অভ্যাস কিনা!

কনের নড়া চড়ার শব্দে এমন অনেক প্রশ্নই মাথায় এলো, কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করবার সাহস হল না। কি জানি ঠকাস্ কী উত্তর আসবে পাথরের টুকরোর মত, অথবা পাথুরে ঢিলের মত।

পরদিন যে কোথায় কী ঘটনা ঘটল কে জানে। কোনো একসময় পিসতুতো বড়দিদি পদ্মলতা চুপি চুপি জিগ্যেস করে বসল, হ্যাঁরে চন্দর—কাল বউয়ের সঙ্গে কথা কসনি? কেঁদে কেঁদে মরছে।

চন্দ্রকান্ত প্রথমে শাদা হয়ে গেলো, তারপর নীল হলো, অতঃপর লাল হলো।

কেন কথা কসনি, কেন? বল?

বহুকষ্টে উত্তরটা আদায় করতে পারল দিদি। বাঃ! কী কথা কইবো?

পদ্মলতা বড়দিদি হলে কি হবে? বড় ফাজিল মেয়ে।

চন্দ্রকান্তর উত্তর শুনে মুখকে অমায়িক আর বিস্ময়াহত করে

বলল, ওমা ! তোদের ইস্কুলে পড়ায় নি, কী কথা কইতে হয় বৌয়ের সঙ্গে ! মাষ্টার শেখায় নি ?

আঃ ! ধ্যেৎ !……

বলে পালিয়েছিল বর, কিন্তু অতঃপর মনের মধ্যে এক নতুন ছন্দের করুণ রাগিনী অনাহত সুরে বেজেই চলেছিল।…বৌ কেঁদে কেঁদে মরছে…বৌ কেঁদে কেঁদে মরছে…বৌ….বৌ…কেমন দেখায় সেই পরীকে কাঁদলে ? কেমন দেখাচ্ছে ? চন্দর কি দেখতে পাবে না একবার ? কেন ? চন্দর কি কেউ নয় ?…বৌকে তোমরা পেতে কোথায়, যদি চন্দর টোপর ফোপর পরে গিয়ে খেটে খুটে নিয়ে না আসতো ? এখন আর চন্দরের কোনো অধিকারই নেই !

কান্না মুখটা দেখতে কেমন এটা ভাবতে ভাবতে নিজেই প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠেছিল বর। আর নিজেকে নিজে ঠাশ ঠাশ করে চড়াতে ইচ্ছে হয়েছিল। এমন বোকা আমি, এমন বুদ্ধু আমি ! বাড়ি সুদ্ধু সবাই জানল, আমার অবহেলায় বৌ বেচারী কেঁদে কেঁদে মরছে।…আর কি কখনো ওরা আমাকে বৌয়ের ঘরে ঢুকতে দেবে ? কক্ষনো দেবে না। দোষ শুধরে নেবার সুযোগ আর পাবো না। আমার ভাগ্য !

তা সত্যি চন্দরের ভাগ্যে সে দোষ শুধরে নেবার সুযোগ আর জুটল না। নাটকের পরবর্তী দৃশ্যে দেখা গেল বৌ হি হি করে হাসছে। চড়বড়িয়ে কথা বলছে।

না, অনেক দিন পরে নয়, সেই দিনই।

সেই দিনই তো অষ্টমঙ্গলায় জোড়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া। সেখানে কান্নার প্রশ্ন কোথায় ? নিজ ভূমিতে এসে তো নিজমূর্তি। বৈঠকখানা বাড়ি থেকেই শোনা যাচ্ছে, বৌ তার সদ্য শ্বশুরবাড়িবা সব অভিজ্ঞতা নিয়ে কোথায় কার সঙ্গে যেন হি হি করছে।

সখীদের সঙ্গে ? না, মা পিসিদের সঙ্গে ?

সখীদের সঙ্গে হলেই তো হয়েছে আর কি। নির্ঘাৎ সেই গত

রাত্তিরের বরের কথা না বলার ইতিহাস ব্যক্ত করবে। সখীরা কি তাহলে চন্দরকে আস্ত রাখবে ?

না:, বোধহয় মা পিসির সঙ্গেই। একজন গিন্নীর গলা শুনতে পাওয়া গেল, গলা ছেড়ে কত হি হি করছিস ? বাড়িতে জামাই রয়েছেন না ?

কিন্তু তারপর ওর তো হি হি-টা বাড়লো বই কমল না।

রয়েছে তো রয়েছে, কী করবে আমায় ? ফাঁসি দেবে ?

হঠাৎ এতোকাল পরে সেই বেপরোয়া গলার প্রশ্নবেশী মন্তব্যটা যেন স্পষ্টই শুনতে পেলেন চন্দ্রকান্ত।

ফাঁসি শব্দটা ফাঁস থেকেই না ?

তেরোদশী কখন ছাড়বে একবার ছাখ তো চন্দর—

কোথায় যেন একটা মিহি জালের নরম বুনুনির উপর একটা ঢিল এসে লাগল।

পাশের দেয়ালের কুলুঙ্গি থেকে পঞ্জিকাখানা পেড়ে নিয়ে উল্টে দেখে বলেন, তেরোদশী ? তেরোদশী—তেরোদশী—তেরোদশী—ছাড়ছে বেলা তিনটেয়।

মরেছে। পিসি ব্যাজার গলায় বলে ওঠেন, তার মানে চৌপর বেলা গড়িয়ে সেই বিকেল বেলায় গেলন।

গেলন !

কী কুশ্রী, কী কুৎসিত শব্দ। শব্দটার ধাক্কায় যেন সকালের এই নির্মল আকাশটা ঘোলাটে হয়ে গেল। কিন্তু শব্দটা কি জীবনে এই প্রথম শুনলেন চন্দ্রকান্ত ? আজীবনই তো শুনে আসছেন। আশৈশব। জেঠি পিসি সেজখুড়িদের মুখে। ওদের জীবনটা যে কত মূল্যহীন, কত ধিকৃত, সেইটা বোঝাবার জন্যেই ওঁরা নিজেদের সম্পর্কে এরকম অবজ্ঞেয় উক্তি করে থাকেন। বিশেষ করে

পিসি। যিনি নাকি জ্ঞানোন্মেষের আগেই বিধবা হয়ে বসে আছেন।

পিসি নিরিমিষ ঘরের রান্না করতে যাবার সময় স্বচ্ছন্দে বলেন, বেলা গড়ালে, যাই পিণ্ডি চড়াইগে।···বাগদি বৌ-কে কদাচ কখনো যদি একখানা কাপড় কাচতে দেন তো বলেন, বৌ আমার ন্যাকড়াখানা সেদ্ধ করা আছে, ঘাট থেকে একটু ডুবিয়ে এনে মেলে দে তো—।

আর মাঝে মাঝে ওই গেলনের মাত্রা একটু বেশী করে ফেলে রোগ বাধিয়ে বলেন, চন্দর তোর ওই হোমো—পাখির দানা মানা দুটো দে দিকিন—পেটটা কেমন গুলোচ্ছে। জানি নিষিন্দে পাতা যমে ছোঁয় না, তবু গেরস্তকে পাছে ভোগাই তাই—

অসুখ করেছে একটু ওষুধ দে—না বলে এতো সব বিশ্রী কথা।

চন্দ্রকান্তর অভ্যস্ত কানও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে। বিরক্ত হয়ে বললেন, কেন? বিকেলবেলাই বা গেলন কেন?

শোনো কথা। কেন—সে কথা জানিস নে তুই? তেরোদশী না ছাড়লে বেগুন চলবে?

চন্দ্রকান্ত তবু বলে ওঠেন, তা বেগুনটা বাদ দিয়ে সময়ে খেয়ে নেওয়া যায় না?

পিসি কদমছাঁট মাথাটায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে খটখটিয়ে বলেন, বেগুন বাদ দেবো? শোনো কথা। বেগুন ছাড়া চচ্চড়ি জমবে? সুক্ত জমবে? ঝালের ঝোলটি জম্পেস হবে? কথাতেই বলে বিধবার বড়ি বেগুনের ঝোল—।

ইহ-সংসারে আর কোনো রান্না নেই? আর কোনো আনাজ নেই?

থাম্ বাবা।

পিসির মুখে একটা উপহাসের হাসি ফুটে ওঠে। যেন একটা অর্বাচীনের কথা শুনলেন।

ছু-ঘণ্টা আগে গিলে কি চারখানা হাত পা বেরোবে ?···যাই ভালই হলো, পিণ্ডি সেদ্ধর আগে ধোঁয়া উনুনে চারটি মুগ কড়াই ভেজে নেওয়া যাবে।

চলে যান পিসি বকের মত পা ফেলে ফেলে।

আবার একটু বসে থাকেন চন্দ্রকান্ত।

আকাশের সেই বর্ণচ্ছটা অন্তর্হিত। সাদা রোদ্দুর দালানের দেয়ালে এসে পড়েছে। উঠে পড়লেন।

নীচের তলায় নেমে এলেন।

নেমে এসেই থমকে যেতে হল, কোথা থেকে যেন সেজখুড়ির চাপা ক্রুদ্ধস্বর উচ্চারিত হতে শোনা গেল, খবরদার। টুঁ শব্দটি না। এ কথা যদি চন্দরের কানে ওঠে, তোমায় আমি বঁটি-কাটা করবো।

কোথা থেকে এলো কথাটা! সিঁড়ির তলায় চোরকুঠুরি থেকে কি? ছুদিকে দেয়াল চাপা সিঁড়িতে তো চোরকুঠুরি একটা থাকেই। চোরকুঠুরি আর চিলেকোঠা—এ ছুটো তো সিঁড়ির সঙ্গে উপরি পাওনা।

সে যাক, কী এই কথা? যা চন্দরের কানে ওঠার এতো ভয়, চন্দরের কানে ওঠানোয় বঁটি-কাটা করার মতো শাস্তি ঘোষণা। কারই বা কথা? কার সঙ্গে চন্দ্রকান্তর বিশেষ কোনো যোগসূত্র আছে!

সেজখুড়িরই গলা কি?

না, বাড়িতে আরো কেউ এসেছে টেসেছে? দিনের অধিকাংশ সময়ই তো সেজখুড়ি শুচিবাইয়ের ধাক্কায় অতিবাহিত করেন। সংসারে কারো সঙ্গেই তো তেমন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। ওনাদের পিণ্ডি সেদ্দর হেঁশেলে ওঁর কোনো কাজ নেন না পিসি ওনার হাতে পায়ে হাজা বলে। তাছাড়া সর্বত্র গোবরজল ছিটিয়ে ছিটিয়ে এমন বদভ্যাস হয়ে গেছে যে, খাবার জিনিসেও সেটা চালান করে বসে।

জল গোবর না হোক নিদেন পক্ষে শুকনো ঘুঁটের গুঁড়ো। খাবার জলের কলসীর মধ্যে, ঘন দুধের কড়ার মধ্যে থেকে প্রায়শঃই জিনিসটা আবিষ্কার হয়। তখনই ব্যাপারটা পুরুষমহলেরও কানে উঠে পড়ে। পিসি তো আর ছেড়ে কথা কইবার মেয়ে নয়, আর জেঠিও ছোট জায়ের প্রতি এতো মমতাময়ী নয়। হৈ চৈতে বাড়ি ভরে যায়।

সেজখুড়ি অবশ্য তাতে খুব দমেন না, তর্ক চালান। বলেন, তা গেলেই বা পেটে একটু গোবর, মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? রাত্তিরদিনই তো পাপপাতক করা হচ্ছে সংসারে, ফোঁকটে যদি প্রাচিত্তির হয়ে যায়, মন্দটা কী?

সেই সেজখুড়ি হঠাৎ নিজে এতো বড় একখানা পাপ সংকল্প ঘোষণা করলেন। আশ্চর্য বৈকি! বঁটিকাটা করবার ভীতি প্রদর্শন। পাপ বলা যায় না? নাঃ, বোধহয় আর কেউ। উনি তো এ সময় উঠোনে গোবর-গোলা ছিটিয়ে বেড়ান।

কিন্তু কী সেই ঘটনা, যা চন্দরের কানে ওঠা সম্বন্ধেই সাবধানতা? মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে করতে চলে এলেন আমিষ রান্নাঘরের দিকের রোয়াকে। এখানেও তো কোনো বৈলক্ষণ নেই। এ ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সুনয়নী যথারীতিই নিজাসনে বিরাজমান।

কাঠের উনুনে সবে আঁচ পড়েছে। ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি. সুনয়নী সেই ধোঁয়ার অন্তরালেই কী যেন করছেন।

চন্দ্রকান্ত এদিকে ওদিকে তাকালেন। না, ধারে-কাছে পিসি নেই, ছোটখুড়িও নেই। সেজখুড়ি তো থাকবেনই না। অতএব নির্ভয়। চল্লিশোত্তীর্ণ চন্দ্রকান্ত এটি দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে আসেন। দরজার কাছে আসতেই ধোঁয়ার ধাক্কা। তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেলে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলেন, এতো ধোঁয়ার মধ্যে কেন? বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো।

আহা, সুনয়নী তো বললেও বলতে পারতেন, রন্ধনশালাতে যাই, তুঁয়া বঁধু গুণ গাই, ধূঁয়ার ছলনা করি কাঁদি—

কবি গ্রন্থকার বৈষ্ণব সাহিত্য রসে রসিক পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত গুপ্তর সহধর্মিণীর উপযুক্তই হত সেটা। কিন্তু তাতো হবার নয়। হবেই বা কেন? ক'জনের ভাগ্যে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ঘটনার ফসল ফলে? ধোঁয়ার আড়াল থেকে সুনয়নীর ঈষৎ ব্যঙ্গরসাশ্রিত চাঁচাছোলা কণ্ঠ উচ্চকিত হলো, জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলছে ডানা। তুমি আবার কী করতে ধোঁয়ায় এলে? সরো সরো, সরে যাও।

সরেই এলেন চন্দ্রকান্ত।

জানেন আর বলা বৃথা। চেনেন তো সুনয়নীকে। দেখে আসছেন দীর্ঘকাল। যতদূর নয়, ততদূর একজেদি এক-বগ্‌গা। অথচ গিন্নী মহলে সুখ্যাতির শেষ নেই। ছোটবৌমা বলতে সবাই অজ্ঞান। ছোটবৌমার মতন লক্ষ্মী মেয়ে নাকি ভূভারতে দুটি নেই।

আরো তো সব বৌ আছে, এক দেয়ালেই ঘর, পার্টিশানের ওপারে বসবাস, বড় জ্যেঠির বৌ-রা, (যাদের সূত্রে সুনয়নী শ্বশুর শাশুড়ীর একমাত্র ছেলের বৌ হয়েও ছোট বৌ) তাদের নিন্দেয় নাকি কান পাতা ভার।

চন্দ্রকান্তর কান নাকি কাছিমের চামড়ায় ঢাকা, অন্তত সুনয়নীর তাই মত। তবু ওই সব নিন্দে-সুখ্যাতি মাঝে মাঝে কানে এসে ঢুকে যায়। ও বাড়ির ওই বড়বৌ, মেজবৌ, সেজবৌ-রা নাকি স্বার্থপর, গতর-কুঁড়ে, নিজের ছেলেমেয়েদের খাওয়ানো মাখানো নিয়েই বিভোর, আর নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। সংসারের আর কারো দিকে তাকিয়ে দেখে না।

মাঝে মাঝেই এসব কানে আসে, পিসিই তোলেন কানে এবং ওদের মুণ্ডুপাত ক'রে পরিশেষে ছোটবৌমার গুণের ব্যাখ্যায় পঞ্চমুখ

হন। শুনে চন্দ্রকান্ত পুলকিত হবেন, 'এই ভেবেই কি তাঁকে শুনিয়ে বলেন? হয়তো সেটাই একটা কারণ, আবার গভীর গোপন আরও কারণ বিদ্যমান। কিন্তু চন্দ্রকান্ত কি পুলকিত হন? চন্দ্রকান্তর কি মনে হয় না—অনেকখানি দাম দিয়ে এই সুখ্যাতিটুকু কিনছে নির্বোধ ছোটবৌ। তার বোধহীনতার সুযোগ নিয়ে সবাই তাকে ভাঙিয়ে খাচ্ছে। চন্দ্রকান্ত যাই ভাবুন, সুনয়নীর বড় সুনাম।

সধবা হয়েও বিধবা গিন্নীদের পদ্ধতিতে নিজের সম্পর্কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য দেখায় বলেই কি সুনয়নীর গিন্নীমহলে এতো প্রতিষ্ঠা? বৌ বটে ছোট বৌমা। ভূভারতে এমন রূপে গুণে আলো করা বৌ আর দুটি দেখবে না।

এই তাঁদের অভিমত।

এই অভিমতের সঙ্গে যোগ হয় 'লোকের বাড়ির বৌ ঝি এসে দেখে শিখে যাক। শরীরকে শরীর বলতে জানে না। আমার আমার বলতে জানে না, সাজগোজের দিক দিয়ে হাঁটে না। এমন নইলে মেয়েমানুষ।'

বলতেই হবে, এইগুলোই যদি 'আদর্শ নারী'র গুণ হয়, তো সুনয়নী সে আদর্শে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট।

সুনয়নীর ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে না, অসুখ করলে কষ্ট হয় না, শীতে শীত করে না, গরমে গরম হয় না, উপোসে পিত্তি পড়ে না, খাবার বেলা পার হয়ে গেলেও খিদে পায় না—এবং সুনয়নীর দিনান্তে একবারও বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। অবকাশ হলেই সুনয়নী বাড়তি কাজ আবিষ্কার করে নিয়ে হাত চালাতে বসে।

কেউ অনুযোগ করলে বলে, দিনের বেলা গা গড়ালে রক্ষে আছে? রাতে ঘুম হবে না। হবে কি হবে না, তার সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে যাচ্ছে কে?

সুনয়নী যে দিনান্তে অপরাহ্ণ বেলায় একবার আর্শি চিরুনী নিয়ে

বসেন. সেটা কেবলমাত্র 'এয়ো-স্ত্রী'র এয়োত্ব রক্ষার্থে, প্রসাধনার্থে নয়।—সুনয়নী যে ভাতের পাতে মাছটুকু নিয়ে বসে, সেও নেহাত পতির মঙ্গলার্থে, জিভের আস্বাদে নয়। সেটা যে নয়, তা বোঝা যায়, অনেক বেশী মজুত থাকতেও, সুনয়নী মাছের কাঁটা চোপড়া কি চুনো মৌরলা রাখবে নিজের জন্যে।—সর্বোপরি রোগ-ব্যাধি হলে সুনয়নী ওষুধ খেতে রাজী হন না, ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলেন, গলায় দড়ি আমার. এইটুকুতেই ওষুধ গিলে মরবো? আগে মরণের রোগ আসুক।—নিজেকে এত অগ্রাহ্য!—এ বৌ-ও যদি 'পাশের ওপর জলপাণি' না পায় তো পাবে কে?

এরকম অনেক কিছুর জানা হয়ে গেছে চন্দ্রকান্তর, অতএব বুঝে ফেলেছেন আর ছাড়া নেই। তবে ভেবে আশ্চর্য হন, দোষগুলো গুণের পর্যায়ে উঠে গেছে কোন্ নীতিশাস্ত্রে? চন্দ্রকান্তর তো মনে হয়, সুনয়নীর মত জেদি, অবাধ্য, অনমনীয় মেয়ে তিনি কম দেখেছেন। কি জানি আদৌ দেখেছেন কিনা!…প্রায়শঃই মনে মনে বলেন চন্দ্রকান্ত, বড় বেশী দাম দিয়ে বড় তুচ্ছ একটা মাল কিনেছ ছোট বৌ। মনে করছ—ভারী, মজবুত, চিরস্থায়ী। দেখো, এতোটুকু অসাবধান হয়েছ কি ভেঙে টুকরো টুকরো।

সারাজীবন সাবধানে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বুকে করে বয়ে নিয়ে চলেছ, বুঝতে পারছ না—কিসের বদলে কী বিকোচ্ছ।

চিরদিন একান্ত সন্নিকটে থেকেও চন্দ্রকান্ত এই অপচয়িত জীবনের একটি নিরুপায় দর্শকমাত্র।

'সন্নিকটে' কিন্তু নিকটে কি?

তবু চন্দ্রকান্ত ছাড়া আর কার হিসেবের খাতায় এই অগাধ অপচয়ের হিসাবটা লেখা হয়ে চলেছে?

দুই

ভিতর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বার বাড়ির দিকে আসছেন, দেখতে পেলেন, শশীকান্ত পাশ দরজা দিয়ে বাইরে থেকে ঢুকে আসছে।

চন্দ্রকান্তর চোখে চোখ পড়তেই সাঁ করে ভিতরে ঢুকে যাবার তাল করেও কেমন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সাঁ করে যাবেই বা কী করে?

শশীকান্তর পরণে সপসপে ভিজে ধুতি, মাথার চুল থেকে জল ঝরছে, কাঁধে একটা ভিজে ফতুয়া গামছার মত লম্বমান। তার থেকেও জল ঝরছে।

দেখেই বোঝা যাচ্ছ ব্যাপারটা 'স্নান' নয়, নেহাতই সবস্ত্রে ডুব মাত্র। হঠাৎ এর কী প্রয়োজন ঘটল?

চন্দ্রকান্তর কণ্ঠস্বরে বিস্ময়, কী ব্যাপার শশী? এ সময় এভাবে?

শশী নামক ব্যক্তিটি বিশ্বসংসারে যদি কাউকে ভয় করে থাকে তো সে ব্যক্তি ভূতও নয়, ভগবানও নয়, মাত্র ছোড়দা। বড়দা মেজদাদের সামনে তো হাত আড়াল দিয়ে তামাক খায় শশী, কিন্তু ছোড়দা? সাক্ষাৎ যমসদৃশ।

তা উপার্জনে অক্ষম অপদার্থ শশীর ভাগ্যটাও এমন মন্দ, আশ্রয় জুটেছে এই যমেরই কাছে। একই সম্পর্কের অন্য দাদারা তো ডেকেও কথা বলে না।

হঠাৎ সামনে যম দেখলে লোকের যা হয়, তাই হল শশীর। শশী ঘাড় গুঁজে কুঁকড়ে কুঁকড়ে যা উত্তর দিল তার অর্থ হচ্ছে—সারারাত গরমে ঘুম হয় নি, ভোরবেলায় ঘেমে যাচ্ছিল, তাই তাড়াতাড়ি খিড়কি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এসেছে।

চন্দ্রকান্ত সন্দেহের গলায় বলেন, সারা রাত যে ঘুম হয়নি, সে

তো মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু এতো গরম পেলে কোথায়? কাল রাত্রে তো খুব বাতাস বইছিল, বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

কী জানি, আমার কি রকম—খুব ঘামটাম রাতে কী হয়েছিল না হয়েছিল কে জানে, এখন এই সকালেই ঘামতে শুরু করে শশীকান্ত —ভিজে কাপড় সত্ত্বেও।

পেট-টেট গরম হয়েছিল বোধ হয়, চন্দ্রকান্ত বলেন, যাও—চট করে ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলোগে—স্নান করতে গিয়েছিলে, গামছা নিয়ে যাওনি! আশ্চর্য! এটা কত অবিধি জান?

না, মানে—ইয়ে ঠিক চানই করব ভেবে যাইনি, জলটা দেখে—

বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল শশী। জলটা দেখে কী ভাবের উদয় হল, সেটা অব্যক্ত রেখে সরেই পড়ল।

চন্দ্রকান্তর কপালে একটা রেখা দেখা গেল, শশীর আচরণটা যেন ঠিক স্বাভাবিক মনে হল না, আমার কাছে যেন কিছু গোপন করল।—রাত্রে কি কোনো অচ্ছুৎ জাতির শবদাহ করতে গিয়েছিল? কিন্তু তাতে গোপনের কী আছে? চন্দ্রকান্ত তো ইতিপূর্বে অন্য ক্ষেত্রে ঘোষণা করে থাকে, 'মড়ার আবার জাত কী? বিপদগ্রস্ত প্রতিবেশীর বিপদে এগিয়ে যাওয়াই উচিত শাস্ত্র'। তবে অকারণ ভয়।.. শশীটা বরাবরই আমায় ভারী ভয় করে! কেন কে জানে! আমি তো কখনো তিরস্কার করি না।

স্বভাবটাই যে শশীর মুখচোরা তাতো নয়, চন্দ্রকান্তর অন্তরালে যে রীতিমত দাপট করে বেড়ায়, সেটা তো অবিদিত নেই কারো। সংবাদ পরিবেশক সংস্থা থেকে জেনে বাড়ি ফিরে একবার শশীকে ডেকে জিগ্যেসাবাদ করতে হবে।

ভাবতে ভাবতে এগোলেন, কারণ এটা চন্দ্রকান্তর প্রাতঃভ্রমণের কাল। নিয়ম করে অনেকখানিটা হাঁটেন তিনি।

পথে বেরোলেই একটা অসুবিধে, দোহাত্তা 'সেলাম' খেতে হবে।

বয়োজ্যেষ্ঠ আর ব্রাহ্মণ বাদে যে কেউ পথে চোখাচোখি হলেই দাঁড়িয়ে পড়বে এবং এগিয়ে এসে পেন্নাম ঠুকবে।

চন্দ্রকান্ত যতই বলেন, প্রত্যহ দেখা হচ্ছে, তবু আবার এসব কেন বাবা? পথের ধুলো—

তা উত্তরটা যোগানোই থাকে। গ্রামের চাষাভুষো, তেলি, মালী, কামার কুমোর, দার্শনিকতায় কেউই কম যায় না। এখন তারক তেলি প্রণামান্তে প্রণামের পদরজঃ মাথায় বুকে ও জিভে ঠেকিয়ে দরাজ গলায় বলে উঠল, পেত্যহ দেকা হলো বলে কি সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের দরজায় মাথা ঠুকবো নি ছোট কত্তা? না— বুড়ো শিবের থানের ধুলোয় গড়াগড়ি দেব নি?

তোরা বড় অধিক বাড়াস তারক। এতো কিসের? আমি তো ব্রাহ্মণ সন্তানও নই।

তারক জিভ কেটে বলে, 'নয়' বলবেন না ছোট কত্তা, আপনি যাঁর সন্তান, তিনি বাস্তুনের দশগুণ বাড়া। মহা মহা বাস্তুনের থেকে চড়া বাস্তুন ছিলেন কবরেজ মশাই। তেমন মানুষ এ তল্লাটে একটা বের করুন দিকিন।... কত কাল হল সগ্গে গেচেন, এখনো সবাই গুর্বোরা তেনার নাম করে ঘুরতেচে!....

তারক জোড়-করে সেই সগ্গের উদ্দেশ্যে একটা পেনতি জানিয়ে বলে, আর ধুলো? ধুলোর কতা বলতেচেন? মহাজনদের চরণপাশে সব ধুলোই 'রজ' হয়ে যায় ছোট কত্তা।

ওরে বাবা, তুই তো বেশ শাস্তর পালা শিখে ফেলেছিস রে তারক। তা যাচ্ছিস কোথা? গায়ে জামা উঠেছে দেখছি। কুটুম বাড়ি বুঝি?

আগো যা বলেচেন। খুকির শউর বাড়ি যেতেচি। মেয়েডারে পেটিয়ে দে অব্দি সব্বদা যেন চতুদ্দিকে শুণ্যি দেকি। খুকির গভ্ভোধারিণী তো মেয়ের খেলাপাতি পুতুলের পেটরি দেকে আর ধরে ধরে ডুকরে ডুকরে কাঁদে। আহা খুকী আমার একটা পুতুলকে

'ছেলে' করেছেলো। সেইটা ছাড়া একদণ্ড থাকত নি, সঙ্গে নে খেতো, কাচে নে শুতো। সেইটা নে যেতে চেয়েছেলো, তা কুটুমবাড়ির পাচে কেউ কিচু বলে তাই ওর গর্ভধারিণী নে যেতে দেয়নি। এখন সেই দুঃখ্যে হাপসে হাপসে মরতেচে।

চন্দ্রকান্তর কন্যা নেই, ভাবেন—ভাগ্যিস নেই। থাকলে তো এই নাটকেরই অভিনয় হতো। দুঃখিত গলায় বললেন, মেয়ের বয়েস কতো?

এঁজ্ঞে—এই সাত পেরিয়ে আটে পা দেবে।

এতো কম বয়সে মেয়ের বিয়ে দিয়েছ কেন তারক? জানো, এখন শিশুকালে বিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে কত পণ্ডিতজন মাথা খাটাচ্ছেন।

তারক একটা উদাস উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলে, পণ্ডিতজনা মাতা খাটাচ্চেন বলে কি আর এই হতভাগা মুখ্যুজনাদের মাতা পোস্কের হবে ছোটকত্তা? এ হতভাগোরা যে আঁদারে, সেই আঁদারেই থাকবে।

চন্দ্রকান্ত একটু কৌতুক অনুভব করলেন। বললেন, আঁধার বলে বুঝতে জানলে তো আর আঁধার থাকত না রে! নিজেই ভেবে দ্যাখ, এখানে মেয়ে পাঠিয়ে তোদের এই কষ্ট, আবার সেখানে কচি মেয়েটারও কত কষ্ট।

তারক মুখটা একটু ফেরায়, কোঁচার খুঁটটা তুলে সারা মুখটা মোছার ছলে চোখ দুটো মুছে নেয়, তারপর গলা ঝেড়ে বলে, সেই শুনেই তো আরো পাঁচজনে বলতেচে শাউড়িমাগী না কি বড্ড মারধোর করে, খুন্তি পুইড়ে ছ্যাঁকা দেয়—

অ্যাঁ! চন্দ্রকান্ত শিউরে উঠে বলেন, তবু এখানে বসে আছিস? নিয়ে চলে আয়।

তারক দোমনা গলায় বলে, সে কথা ভাবি। তবে আমার ব্যাই লোকটা ভাল বেচক্ষণ। ও পরিবারকে ধমকে দে বলে, চার কুড়ি

ট্যাকা পণ দে বৌ এনিচি, সেই বৌকে যদি মেরে ধরে মেরে ফেলিস, আর বৌ জোটাতে পারবো আমি? মরিস মাগী চেরদিন হাঁড়ি ঠেলে। তাতেই মাগী এটটু সমজায়। খুকীর শউরবাড়ির পাশেই আমার এক ভাগ্নীর শউরবাড়ি, তাই এতো বিত্তান্ত জানা।

চন্দ্রকান্তর ভিতর থেকে একটা গভীর নিঃশ্বাস ওঠে। কত সহজে কত ভয়ানক অনাচার মেনে নেয় এরা! এ নিয়ে চলেছে সমাজ।

নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, তোর বেয়াই ভাল বলেই কি তোর ভরসা আছে? ভেতরকার কলকাঠি তো মেয়েছেলেদের হাতে। এতো কচি বয়সে বিয়ে দেওয়াটা বাপু খুব খারাপ। প্রতিজ্ঞা করে এর একটা বিহিত করা উচিত।

তারকও নিঃশ্বাস ফেলে—গরীবের কি আর ইচ্ছে পিতিজ্ঞে খাটে ছোট কত্তা? আমার জেঠাতো ভাই চরণ—সেও তো ছ'বছরের মেয়েটার বে ঠিক কর ফেলেচে। ঠেকায় পড়ে কতদিন হল জমি বন্দক দে রেকেছিলো, ছাড়াতে মুরোদ হচ্ছে না, মেয়েটার বে দে পাঁচ কুড়ি এক ট্যাকা পণ পাবে, জমিটা ছাড়ান করে দিতে পারবে।

ওঃ! তাহলে মেয়েও তোদের ঘরে এক একটা তালুক বল? দশটা মেয়ে থাকলে রাজা!

চন্দ্রকান্ত বিষণ্ণ মনে এগিয়ে যান। তারপর ভাবেন, কিন্তু তারকদেরই বা অবজ্ঞা করছি কেন? আমাদের উচ্চবর্ণের ঘরেও তো ওই একই অবস্থা। শুধু জিনিসটার হেরফের। মেয়ে নয় ছেলে।···ছেলে মানেই তালুক। নচেৎ শশীর বিয়ের সময়ও সেজ খুড়ি পণের কথা ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন কেন—পরোক্ষে আদায়ও তো করেছিলেন। চন্দ্রকান্ত কন্যাপক্ষের কাছে দাবি করতে দেননি বলে নিজেই সেই দাবির টাকা খুড়ির হাতে ধরে দিয়েছিলেন —'ছেলের বিয়ের খরচা কোরো' বলে। এতে সকলেই অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

পিসি তো বটেই, সুনয়নীও। তাছাড়া বড়দা? একদা যিনি

বাড়িতে পার্টিশান তুলে ভাগ ভিন্ন হবার চেষ্টায় সব থেকে বেশী জোরদার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং বিধবা পিসি খুড়িদের মত আলতু ফালতু মালকে ঠাঁই দেবার মত ঠাঁই তার নেই ঘোষণা করে দায়িত্ব-মুক্ত হয়েছিলেন, তিনি কেমন করে যেন সহসা অনাথা সেজ খুড়ির ছেলের বিয়ের ব্যাপারে প্রধান অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে বসে সমস্ত ব্যাপারেই চন্দরের গোঁয়ার্তুমি দেখছিলেন, আর সেজ খুড়ির হৃদয়-বেদনার শরিক হচ্ছিলেন।

সকলেরই বক্তব্য—একটু চাপ দিলেই কনের বাপের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে নেওয়া যেত। গোঁয়ার্তুমির বশে অথবা বুদ্ধির দোষে সেই মোটা পাওনাটি পেতে দিলে না তুমি বেচারী বিধবা খুড়িকে। এখন নিজে গচ্ছা দিয়ে চন্দ্রকান্ত. নিজের মুখ রাখছে। কিন্তু তাতে কার কী, মেয়ের বাপকে চাপ দিয়ে 'বাপ' বলিয়ে কতটি ঘরে তোলা যেত, জানো তুমি !

আদর্শ বৌ সুনয়নী পিস-শাশুড়ীর গোড়েই গোড়। চন্দ্রকান্তর সামনে তিনি শাশুড়ীদের সঙ্গে কথা বলেন না, কিন্তু চন্দ্রকান্তর কানে পৌঁছনোয় বাধা ঘটে না। ঘোমটা দিয়ে পিস-শাশুড়ীর পিছনে বসে বলেন, যা বলেছ পিসিমা, একেই বলে গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।

উচ্চবর্ণের বলে কতই অহংকার আমাদের, কিন্তু জীবনচর্চায় ওদের সঙ্গে তফাৎ কোথায় ?

শুধু ওদের বলে নয়, আমাদের বলে নয়, সমগ্র সমাজটারই রন্ধ্রে রন্ধ্রে শনি। কুপ্রথা আর কুসংস্কারের নৈবেদ্য সাজানোই আছে সেই শনি-দেবতার পুজোর জন্য। দেবতা আর সিংহাসনচ্যুত হবেন কি করে ?

আস্তে আস্তে পথ হাঁটেন চন্দ্রকান্ত। মাথার মধ্যে একটা ছন্দ পাক খাচ্ছে, দু একটি তীব্র শব্দ সম্বলিত জ্বলন্ত ছত্র সেই ছন্দকে আশ্রয় করে থিতু হয়ে বসতে চাইছে, কিন্তু হচ্ছে না।...কলম কাগজ

নিয়ে না বসলে ঠিক হয় না। তৈরি হয়ে ওঠা ছত্রগুলোও যেন হাত ফসকে পালিয়ে যায়।

কতকাল ঘুমাইবি আর ?

কত যুগ যুগান্তর হয়ে গেল পার।

এ যে তোর মৃত্যুঘুম, এর থেকে হবি না উদ্ধার ?

—নাঃ, শেষ ছত্রটা অচল।

বেড়িয়ে ফিরেই দোয়াত কলম নিয়ে বসতে হবে।

এই যে বাবাজী বের হয়েছ ?

খড়ম খট্‌খটিয়ে এগিয়ে আসেন বটু ভট্‌চার্য। বটু ভট্‌চার্যের পরণে ছালটির ধুতি, গায়ে শক্তি নামাংকিত নামাবলী, কপালে রক্তচন্দনের টীকা, মাথায় রক্তপুষ্প সম্বলিত শিখা, পায়ে উঁচু খুরো খড়ম, হাতে পিতলের জালিকাটা সাজি।···সারা সকাল বটু ভট্‌চার্য এই সাজিটি হাতে ঝুলিয়ে ফুল সংগ্রহ করে বেড়ান। পাড়ায় হেন বাড়ি নেই, যে বাড়ির উঠোনে বাগানে বটু ভট্‌চার্যের প্রবেশাধিকার নেই। আপন শক্তিতেই এ অধিকার অর্জন করে নিয়েছেন তিনি।

বটুর ভয়ে গাছের ফুল সামলাতে যে যত ভোরেই উঠে পড়ুক, বটু তার আগে এসে হাজির।

লোকেদের আপন গাছের ফুল সামলানোর ওই অপচেষ্টাকে ধিক্কার দেন বটু। ছিঃ! ছিঃ! রাত থাকতে গাছটাকে নির্মূল করে ফেলেছিস ?···বলি তোর ঠাকুর আর বটু ভট্‌চার্যের ঠাকুর কি আলাদা রে ?···বটু যখন তার ঘরে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেয়, খোদ সেই জগজ্জননী মায়ের পায়ে গিয়ে পড়ে, বুঝলি ? তবে ? তবে আবার নির্বুদ্ধির মতন ফুল সামলে মরিস ক্যানোরে বাপু ?

বটু ভট্‌চার্য শূদ্র যাজক, ব্রাহ্মণ যাজক পুরোহিত মহলে ওঁর কলকে নেই। কিন্তু বটু নিজেকে 'সাধক' বলে প্রতিপন্ন করে বিশেষ কলকে-র আশা পোষণ করে থাকেন। তাই বটুর কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, তিনি বুঝি সেই জগজ্জননী মায়ের খাস মহলের প্রজা।

কিন্তু লোকে ওঁর পিছনে বক দেখায়, মুখে হাত আড়াল দিয়ে হাসে। কারণ আছে। বটুর বয়স অপরাহ্নে চলে এলেও, মন্দ লোকে বলে থাকে, বটু ভটচার্যির এই শেষরাত থেকে সাজি হাতে নিয়ে বেড়ানোর উদ্দেশ্য আলাদা, সাজিটা ছল। নচেৎ ঘাটের পথগুলি ছাড়া আর পথ খুঁজে পান না কেন ভটচার্য ?

সকলেই অশ্রদ্ধা করে, হাসাহাসি করে, তবু মুখের উপর বড় কেউ কিছু বলে ওঠে না। কারণ, রাগলে বটুর জ্ঞান থাকে না, শাপ শাপান্ত করে ছাড়ে।...তদুপরি আবার বটুর এক মাসি, যিনি বটুর বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী, তিনি নাকি আবার তুকতাকে পটিয়সী। আর শনি, মঙ্গলবারে— অমাবস্যা পড়লে তাঁর উপর মা কালীর ভর হয়।

এ লোককে চটানোর সাহস হয় না। তাই যে যার গাছের ফুল সামলাবার চেষ্টা করে। বৌ ঝি-রা সামলে মরে আপন আপন স্নান-দৃশ্য।

চন্দ্রকান্ত এই লোকটাকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করেন। অথচ এমনই আশ্চর্য, প্রত্যহ প্রাতঃকালে ওর মুখ-দর্শন করতেই হবে। যে রাস্তা দিয়েই হাঁটুন, কোনোখানে না কোনোখানে বটু এসে আবির্ভূত হবেনই।

বটুর হাতের বৃহৎ সাজিটি ভর্তি হয়ে উপচে পড়তে চাইছে, তবু বটু লালায়িত দৃষ্টিতে শোভারাম ঘোষের উঠোনে ফুটে থাকা কাঠচাঁপাগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতেই বলে ওঠেন, বাবাজীর আমার শরীরে আলস্য বলে কিছু নাই।...ওবের আকাশের সূয্যি, আর এই আমাদের ঘরের চন্দর, সমান নিয়মী।

এতো জুৎসই একখানা কথা বলে ফেলতে পেরে বটু বড় আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন।

চন্দ্রকান্ত পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার তাল করতে করতে বলেন, আপনিও তো কম নিয়মী নন ভটচার্য মশাই ! নিত্যই এই এক সময়—

আমার কথা বাদ দাও বাবা। বটু বলেন, আমার কি বিছানায় পড়ে থাকার জো আছে বাবাজী? দজ্জাল বেটি ঘাড় ধরে উঠিয়ে ছাড়ে। বেটির এই হতভাগা বটুককে নিয়ে যে কী খেলা—এই, এই আহা অমন করে আঁকশি দিসনে রে! মড়কা ডাল—

কিন্তু ততক্ষণে শোভারামের বছর আষ্টেক নয়ের মেয়েটা আঁকশি বাগিয়ে কাঠচাঁপার থোকা থোকা ফুলসমেত ডালের আগাগুলো ভেঙে ভেঙে কোঁচড়ে ভরে ফেলেছে।

বটু আর চন্দ্রকান্তর দিকে ফিরে তাকান না, ওই মেয়েটার প্রতিই মনোনিবেশ করেন। আঁকশি দিয়ে ওভাবে ফুল পাড়া যে কত গর্হিত, সেটা বোঝাবার জন্যে বার বার তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেন এবং ইস্—সব ফুলগুলো তুলে নিয়ে নিলি, আমার মায়ের জন্যে কিছু রাখলি নি?....বলে জোর করে মেয়েটার কোঁচড় থেকে কিছু ফুল নিয়ে নিজের সাজিতে ভরেন।

মেয়েটা হঠাৎ একবার ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠে।

পরক্ষণেই আঙুল মটকে মটকে বিজবিজ করে গাল দেয় এবং পলায়নপর বটুর পিছন দিকে জিভ দেখায়।

পলায়নই ভালো, কারণ মেয়েটার ভ্যাঁ করা দেখেই বেগতিক বুঝেছেন বটু।

চলে যেতে যেতেও ঘটনাটা শেষ অব্দি চোখ এড়াল না চন্দ্রকান্তর। ভিতরে ভিতরে ভারী একটা গ্লানি বোধ করলেন। সকালের আলোয় আর জীবনরসের আস্বাদ নেই।

শ্রদ্ধা করবার মতো মানুষ ক্রমশঃই চলে যাচ্ছে ইহ-সংসার থেকে। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখব এমন মুখ বিরল। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখার কথা ভাবতে গেলেই বাবার কথা মনে পড়ে যায় চন্দ্রকান্তর।

কী ছিল সেই মুখে—যাতে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে করতো! এখন একটা ছোট ছেলেকে দেখতে পাচ্ছেন চন্দ্রকান্ত, যে ছেলেটা খেলতে খেলতে পড়তে পড়তে, কোনো কিচ্ছু না করতে করতেও চোখ তুলে অপলকে তাকিয়ে আছে তার বাবার মুখের দিকে। কিন্তু শুধুই কি সেই ছোট ছেলেটাই? একজন যুবা নয়? একটি বিবাহিত পুরুষ নয়? একজন পুত্রের পিতা নয়?

তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন বিভোর হয়ে যেত।

কী ছিল সেই মুখে? দীপ্তি? প্রসন্নতা? ঔদার্য? নাকি গাম্ভীর্য, গভীরতা, আত্মমগ্নতা? কিসে আকৃষ্ট হতো সেই ছেলেটা? সব মিলিয়ে একটা আশ্রয়, এই তো?

আমি আমার ছেলের হৃদয়ে সেই আসন পাততে পারিনি—

নিঃশ্বাস ফেললেন চন্দ্রকান্ত। আমারই অক্ষমতা। পিতাপুত্রের হৃদয়ে হৃদয়ে কোনো গভীর যোগসূত্র তো নেইই, পারিবারিক জীবনে, পরিবারের সকলের মধ্যে যে সাধারণ যোগসূত্র থাকে, তাও প্রায় দুর্লভ। এতো কম দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে ওর সঙ্গে আমার যে, দুটো সহজ কথার আদান-প্রদানও হয় না।—অথচ বাবার কাছে গল্পচ্ছলে আমি কত কী শিখবার সুযোগ পেয়েছি!

বাপের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যেতে পারে, এমন পরিস্থিতিগুলি সযত্নে পরিহার করে নীলকান্ত। সেটা চন্দ্রকান্তর অজানা নয়। তবু ছেলেকে দোষ দেন না। ভাবেন, আমারই ত্রুটি। আমার মধ্যেই সে শক্তির অভাব যে শক্তিতে আপন আত্মজের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করা যায়। এটাই তো সংসারে সব থেকে কঠিন ঠাঁই।

অথচ সুনয়নী কতো সহজেই সে প্রভাব বিস্তার করে বসে আছেন। মা-কে নীলকান্ত প্রাণতুল্য ভালবাসে, আবার যমতুল্য ভয় করে।—মার সঙ্গে দিব্যি মাই ডিয়ার ভাবে গালগল্পও করে বসে বসে, আবার মা একটু চোখ রাঙালেই কাঁটা।

এটা কী করে হয় জানা নেই চন্দ্রকান্তর।

এমনিতে তো সুনয়নীকে মান মর্যাদা বজায় রাখা কাজ করতে বিশেষ দেখেন না। সুনয়নী অনায়াসেই পানের বাটা বিছিয়ে বসে সাজতে সাজতে নিজের মুখে একটা ফেলে, অপর একটা ছেলের দিকে বাড়িয়ে ধরতে পারেন, আবার অতি সহজেই দূরহ আমার সুমুখ থেকে, তোর মতন হাড় বজ্জাত ছেলের মুখদর্শনেও পাপ—' বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতেও পারেন।

ওই পান দেওয়ার ব্যাপারটা একদিন চোখে পড়ে যাওয়ায় চন্দ্রকান্ত সুনয়নীকে বোঝাতে উদ্যত হয়েছিলেন, কাজটা অসঙ্গত। এতে মাতৃসম্ভ্রম ক্ষুন্ন হয়, কিন্তু বোঝানো হয়নি। সুনয়নী প্রথম পর্বেই খাবাড়ি দিয়ে বলে উঠেছিলেন, অতো বিচার করলে চলে না। ছেলে কি কুটুম? তাই সর্বদা হিসেব করে চলতে হবে, কিসে আমার মান থাকবে আর কিসে মান যাবে!—যখন যা ইচ্ছে হবে করব,—বকার সময় বকব, আহ্লাদ দেবার সময় আহ্লাদ দেব। চুকে গেল ল্যাটা,—সাধে কি আর নীলে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়? দেখা হলেই তো উপদেশ ঝাড়বে!

আমি কি ওকে খুব উপদেশ দিই?

সুনয়নী ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে জাঁতি চালিয়ে সুপুরি কাটতে কাটতে বলেছিলেন, মুখে গ্যাজ গ্যাজ করে না দাও, চোখ মুখের ভাবেই বুক হিম করে দাও। তোমার দিকে ঘেঁসবে কি! আমি ডাকাবুকো ডাকাত, তাই তোমার ভয় খাই না। আর সবাইকে দেখো।

কিন্তু নিজের ওই অপরের বুক হিম করে দেবার ক্ষমতাটা সম্পর্কে সচেতন নন চন্দ্রকান্ত। নিজেকে তো খুব নীরব রাখতেই ভালবাসেন। তাই রেখেই চলেন। অথচ লোকে যে তাঁকে ভয় করে, সমীহ করে দূরে রাখতে চায়—তাও চোখ এড়ায় না। এর অর্থ অনুভব করতে পারেন না।

—হ্যাঁ, আমারই ত্রুটি, মনে মনে ভাবলেন চন্দ্রকান্ত—আমার অক্ষমতা, আমি কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারি না।—কিন্তু কার

সঙ্গে হবো? কোথায় সেই অন্তর? যার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ইচ্ছে জাগে?

বড়দীঘির ধার পর্যন্ত হেঁটে আবার ফিরে আসা, এটাই সাধারণতঃ নিয়ম চন্দ্রকান্তর। আজও তাই ফিরছিলেন, দেখলেন সামনে উদ্ধব দুলে। তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে।

দাঁড়ালেন।

উদ্ধব রাস্তার ধুলোমটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে একটা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম সেরে নিয়ে দু'হাতে নিজের কান দু'টো মুলে বলে উঠল, ছোটকর্তা বাবু, অপরাধ নিবেন নি। আপনার জন্যিই আমরা ছোটলোকরা এ্যাখনো মাতা হ্যাঁট করে আচি, কিন্তুক আর বোদায় চলবে নি।—ছোঁড়া ছোকরাগুলানকে থামিয়ে রাখতে পারতেচি নে—

চন্দ্রকান্ত অবাক হলেন।

বলতে গেলে প্রায় আকাশ থেকেই পড়লেন। চন্দ্রকান্ত বলেন, কী হলো রে উদ্ধব? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না—

উদ্ধব ক্ষুব্ধ উত্তর দেয়, পারবেন নি তা জানি। আপনি হল গে আকাশের দ্যাবতা, মাটির পিরথিমির খবর বাত্তা জানেন নি। তবে আপনার নাগাল য্যাখন পেনু একবার, ত্যাখন জানিয়ে রাখি, অ্যাকটা কিছু ঘটে গেলে দোষ নিওনি। আমরা ছোটলোক, মুখ্যু, হতভাগা, সবই মানতেচি। তবে আপনাদের বড়লোকদেরও এডা মানতি হবে, ছোটলোকের ঘরের মেয়েছেলেদেরও ইজ্জৎ আচে।

চন্দ্রকান্ত দিশেহারা দৃষ্টিতে তাকান।

ব্যাকুলভাবে বলেন, তোর কথাটাতো আমি—

কথা শেষ হয় না, কোথা থেকে বদন দুলে এসে দাঁড়ায়। উদ্ধবের ভাইপো। কালো পাথরে কোঁদা চেহারা, ঘাড়ে বাবরি চুল। চওড়া

মুখটার ধারে পাশে ওই চুলগুলো ফুলে থাকায় মুখটায় যেন সিংহ সিংহ ভাব। হাতে মাথা ছাড়ানো বাঁশের লাঠি।

বদন উদ্ধবকে প্রায় ঠেলে দিয়ে বলে, তুই এখেনে কী করতেচিস?

উদ্ধব ঠেলা খেয়ে রেগে উঠে বলে, করব আবার কী? ছোট-কর্তাকে দেখনু তাই একটা পেন্নামের জন্যি—

আচ্ছা হয়েছে তো পেন্নাম? যা ঘর যা—

যাচ্চি বাবা যাচ্চি, বুড়ো উদ্ধব জোয়ান ভাইপোর তাড়নায় অনিচ্ছার সঙ্গে চলে যায়।

চন্দ্রকান্ত ফিরতে যাচ্ছিলেন, বদন মাটিতে একটু হেঁট হয়ে একটা প্রণামের মত করে নিয়ে বলে ওঠে, খুড়ো কী বলতেছেলো?

বদনের কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তাপ।

চন্দ্রকান্ত বোঝেন, ভিতরে কোনো গৃহ-কলহের ব্যাপার আছে। আবার চিন্তা করেন—কিন্তু উদ্ধবের বক্তব্যের সঙ্গে তো ঠিক গৃহ-কলহের সুর নেই, তার অভিযোগ যেন ভদ্দরলোকেদের বিরুদ্ধে। তবে কোনো চাপা আগুনকেই উস্কোনো ভাল নয়, তাই মৃদু হেসে বলেন, কী আর বলবে? ভক্তিটক্তি দেখাচ্ছিল।

বদন তার বাঁয়ের দিকে এসে পড়া বাবরি চুলের গোছা মাথা ঝাঁকিয়ে পিঠের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, খুড়োর মাথাটায় ইদানীং একটু গণ্ডগোল হয়ে গ্যাচে—বুজলেন। ওর কতা বিশ্বেস করবেন নি।

চন্দ্রকান্ত বললেন, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি আছে? উদ্ধব তো কিছু বলেনি।

না বললিই ভালো, হট খট এটা ওটা বলে বেড়ায়, তাই বলতেচি।

বদন হাতের মাথা ছাড়ানো বাঁশের লাঠিটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে গটগটিয়ে চলে যায়।

চন্দ্রকান্তর মনে হয়, ওর ওই ভঙ্গীটার মধ্যে যেন কোনো একটা কঠিন সংকল্পের রূঢ় দৃঢ়তা।

চন্দ্রকান্তর চেতনার গভীরে একটা আসন্ন অশুভের ছায়া পড়ে।

কোথায় কী হয়েছে?

কোথায় কী হতে পারে?

উদ্ধবের কথায় কিসের ইসারা ছিল?

চিন্তামগ্নভাবে খানিকটা চলতে চলতে—জোর করে মনের অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেললেন। —দূর, ওই ভাইপোটার কথাই বোধ হয় ঠিক। উদ্ধবের মাথার মধ্যেই কোনো গণ্ডগোল ঘটেছে।

অস্বস্তিকে একেবারে দূরীভূত করতে, নতুন যে গ্রন্থের পরিকল্পনা করেছেন, তার চিন্তা করেন। কাব্য ছেড়ে—গদ্য লিখতে হচ্ছে। প্রথম দু'একবার ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনেই লিখতে শুরু করেছিলেন, পছন্দ হয়নি, ঠেলে রেখে দিয়েছেন। বঙ্কিমবাবুর অক্ষম অনুকরণ বলে ঠেকেছে। একটা নতুন সামাজিক জীবন নিয়ে ভাবছেন চন্দ্রকান্ত। যে ভবিষ্যৎ সমাজের ছবি মনের মধ্যে মাঝে মাঝেই উজ্জ্বল আশ্বাসের বাণী বহন করে নিয়ে এসে আশার আলো দেখায়, সেই সমাজের কাহিনী রচনা করতে চান চন্দ্রকান্ত। এই চাওয়াটা কি ধৃষ্টতা?

মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন চন্দ্রকান্ত। যদি লিখে উঠতে পারেন, সে গ্রন্থের নাম দেবেন: আগামীকালের আলেখ্য।

সেই আগামীকালটা যে ঠিক কোন কালের মঞ্চে পা ফেলবে, সেটা এখনো বুঝতে পারছেন না চন্দ্রকান্ত। একশো বছর পরে—ওঃ, সে যে বড় দূরে! তবে আশী বছর পরে? সেও কম কি? আরো কমেই বা নয় কেন? সত্তর, ষাট, পঞ্চাশ। তখন দেশের এবং সমাজের অবস্থা কেমন হতে পারে! অথবা বলা যায়, কেমনটি হলে ভাল হয়। মাঝে মাঝে তারই এক-একটা রোমাঞ্চময় কল্পনায় আন্দোলিত হন চন্দ্রকান্ত। টুকরো টুকরো ছবি মনের মধ্যে ভেসে ভেসে ওঠে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ একটা খসড়া করে ফেলে, তাকে রূপ

দেবার চেষ্টায় সফল হতে পারছেন না। চিন্তার খেই হারিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। দানা বাঁধতে পারছে না।

কী কী হলে ভাল হয়, আর কতটুকু হয়ে ওঠা সম্ভব, এই দুটো চিন্তার সংঘর্ষে সেই ভবিষ্যৎকালের কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর চরিত্রগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে না, ঝাপসা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

শুধু একটা শর্ত নিশ্চিত সত্য রূপে বিদ্যমান, সেটা হচ্ছে—সেই কালের চেহারা হবে,—দেশ পরাধীনতার গ্লানি মুক্ত, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের মহাদান—ভারতবাসীই ভারতবর্ষের অধীশ্বর। আরও একটা শর্ত, সেই ভাবী সমাজে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারী-সমাজের জীবন কেবলমাত্র ধূমলিন রান্নাঘরের মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছে না। লজ্জার ওজনটা তাদের শুধু ঘোমটার দৈর্ঘ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। লজ্জাস্কর বস্তু যে অন্য অনেক আছে সে বোধ জন্মেছে। তাদের চিন্তার জগতে ত্রয়োদশীতে বেগুন খাওয়া না খাওয়ার প্রশ্নটাই একটা বৃহৎ জায়গা দখল করে নেই, বৃহৎ পৃথিবীর বিচিত্র জীবনচর্চার সঙ্গে একাত্মা হবার স্বাদের আশায় উন্মুখ হচ্ছে তারা। ছোট গণ্ডী ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসবার সাধনা করছে। জীবনের এই নিদারুণ অপচয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু শুধুই কি নারী জাতির উন্নতির কথাই ভাবেন চন্দ্রকান্ত?

জীবনের অপচয়ের দৃশ্য তো অহরহ সর্বত্র।

কী অলসতা, কী কর্মহীনতা! কেবলমাত্র তাস পাশা খেলে, মাছ ধরে আর বাজে গালগল্প করে বৃথা জীবনযাপন করছে গ্রামের অধিকাংশ ছেলে। চিন্তাহীন উদ্যমহীন এই নিরেট মুখগুলো দেখলে কেমন একরকমের অস্থিরতা আসে চন্দ্রকান্তর। এসবের কী-ই বা লিখতে পারবেন চন্দ্রকান্ত? কতটুকুই বা লিখতে পারবেন?

ভাবতে ভাবতে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

অশ্বত্থতলার ছায়ায় এই সকালবেলাই সেই অপচয়ের একটু

যমুনা। গাছের গোড়ায় ধুলো মাটি আর শিকড়ের উপর চেপে বসে গোটা পাঁচ-ছয় ছেলে। কে ওরা? নীলকান্তর মত কে যেন!

না, নীলকান্ত নয়। কিন্তু হলেও হতে পারতো। সেই বয়েসেরই ছেলে কটা। হাঁটুর উপর ধুতি তোলা, খালি গা, খুব হাত মুখ নেড়ে গল্প করছে, জায়গাটা তামাকের গন্ধে ভরপুর। অথচ ধারে কাছে হুঁকো-কলকের চিহ্ন নেই। তার মানে অন্য কোনো পদ্ধতিতে ধোঁয়া খাওয়ার চাষ চলছে। হাতের মধ্যে গাছের পাতা পাকিয়ে কেমন করে যেন টান দিতে শেখে এরা।

ওরা চন্দ্রকান্তকে না দেখতে পাওয়ার ভান করছে।

চন্দ্রকান্ত যে ওদের দিকেই এগিয়ে আসবেন, তা ভাবেনি। এসে পড়েছেন দেখে তাড়াতাড়ি গা-ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। চন্দ্রকান্ত শান্ত গলায় বললেন, সকালবেলা এভাবে বসে কেন বাবারা? কাজকর্ম নেই?

ওরা ঘাড় চুলকে বলল, না—ইয়ে বারোয়ারীতলায় যাত্রাগান হবে সেই খবরটার জন্যে—

বারোয়ারীতলায় যাত্রাগান হবে? কবে?

আজ্ঞে ওই, কবে যেন রে সাধু?

ইয়ে মনসার ভাসানের দিন।

মনসার ভাসান? সে কি? তার ত এখন অনেক দেরী।

না, না, মনসাপুজোর দিনকে।

মনসা পুজো? দশহরার দিনের কথা বলছ?

ছেলেগুলো উত্তর খুঁজে পেয়ে মহোৎসাহে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই না রে ভজা?

তারও দেরী আছে বাপু, এখন তো সবে বৈশাখ চলছে। তার জন্যে এখন থেকে কী হচ্ছে? তোমরা করবে যাত্রাগান?

বলা বাহুল্য, অধোবদন হল ওরা।

চন্দ্রকান্ত নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, দিনের শ্রেষ্ঠ কাল সকাল, আর

জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল কৈশোরকাল। ছুটোই বৃথা অপচয় কর্মো না তোমরা। আর কারো ক্ষতি হচ্ছে না—নিজেদেরই ক্ষতি করছো।

ছেলেগুলো আমতা আমতা করছিল। চন্দ্রকান্ত চলে যেতেই আবার বসে পড়ে বলে উঠল: এই এক গুরু-ঠাকুর আছেন বাবা গাঁয়ে, কারুর একটু স্বস্তি আছে! বদ্যির ছেলে, নাড়ি টিপে বেড়া না বাবা, তা না কেতাব লিখছে, আর যাকে পারছে ধরে ধরে লেকচার শোনাচ্ছে।

দূর! আমেজটাই মাটি করে দিল। দিব্যি মৌজ করে বসা হয়েছিল। ব্যাটা, ছু'দশ বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিস বলে যেন যারা পরে এসেছে তাদের মাথা কিনে নিয়েছিস। ধ্যেৎ!

আর চন্দ্রকান্ত যেতে যেতে ভাবছিলেন, বড়দের দেখলে তটস্থ হয় এখনো, এটুকু সভ্যতা আছে ছেলেগুলোর মধ্যে। অর্থাৎ এখনো আদায় আছে।

এই জীবনগুলোকে যদি ঠিক পথে চালিত করা যেতো!

ফের সেই পুরনো ভাবনাতেই ফিরে আসেন চন্দ্রকান্ত, কিন্তু ভাবনা আর অধিক দূর অগ্রসর হতে পারে না। বর্তমানের পাথুরে পরিবেশটা যেন চন্দ্রকান্তের ওই চিন্তার বিলাসকে ছুয়ো দিয়ে ব্যঙ্গ হাসি হাসতে থাকে।

বাবা, বদ্যি জ্যাঠা—

বালককণ্ঠের এই উচ্ছ্বসিত উক্তিতে চমকে তাকালেন চন্দ্রকান্ত।

গৌরমোহনের ছেলে গোবিন্দর গলা না?

বাবা বলে কথা বলল। গৌরমোহন এসেছে তাহলে?

হঠাৎ ভারী ভাল লাগল। চন্দ্রকান্তর মনে হলো, ঠিক এই মুহূর্তে গৌরমোহনকেই যেন খুব দরকার ছিল তাঁর।

ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন।

সামনেই গৌরমোহন।

দুজনেরই মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

আরও একবার মনে হল চন্দ্রকান্তর—আশ্চর্য। টের পাচ্ছিলাম না, এখন বুঝতে পারছি—ঠিক এই মুহূর্তে গৌরমোহনকেই বড় দরকার হচ্ছিল আমার। গৌরমোহনের কাছাকাছি এলে মনে হয়, সংসারে অন্তরঙ্গ হতে পারার মত মানুষ হয়তো একেবারে বিরল নয়।

কবে এলে?

কাল সন্ধ্যায়।

গৌরমোহনের একটা হাত আঁকড়ে ধরে আছে তার বালক-পুত্র গোবিন্দ, গৌরমোহনের অপর হাতে একখানা পাট করা খবরের কাগজ।

তোমার কাছেই আসছিলাম—

গৌরমোহনের স্বর উৎফুল্ল।

তোমার কাছেই চলো—

চন্দ্রকান্তর স্বরে গভীর অভিব্যক্তি।

তিন

একখানা ময়লা গামছা কোমরে জড়িয়ে আর একখানা ময়লা গামছায় গা মাথা রগড়ে মুছতে মুছতে শশীকান্ত চাপা আক্রোশের গলায় বলে ওঠে, এই তুমি। তুমিই হচ্ছো যত নষ্টের গোড়া।

নিবারণী দেবী, যিনি নাকি চন্দ্রকান্তর সেজ খুড়ি, মিনমিনে গলায় বলেন, কেন? আমি আবার তোর কী পাকাধানে মই দিলাম?

দিলে না। দিলেই তো? রাতদিনই দিচ্ছো। শশী, বাবা, রাতে যা করিস তা করিস, ভোরে খিড়কির থেকে একটা ডুব দে তবে ঘরে আসিস—

মায়ের বাকভঙ্গীর অনুকরণ করে ভেঙিয়ে উঠে কথা শেষ করে শশীকান্ত—জগৎ সংসারে সবাই জানে, বেটাছেলে আড়াই পা বাড়ালে শুদ্ধ, উনি শুচিবাই বুড়ি এলেন নতুনশাস্তর নিয়ে। ঘাট থেকে ডুব দিয়ে আসতে গেলে লোকের চোখ বাঁচাতে পারবে তুমি? হয়ে গেল আজ মোক্ষম। একেবারে যমের মুখোমুখি।

কথার মাঝখানে শশীর বৌ অশ্রুমতী গলা অব্দি ঘোমটায় ঢেকে নিঃশব্দে একখানা জলকাচা ধুতি এনে শশীর কাছ বরাবর মাটিতে নামিয়ে রেখে গেল। নিবারণী তার দিকে একটা তিক্ত দৃষ্টি হেনে দাঁতে দাঁত চেপে বলে ওঠেন, আর এই এক হয়েছে জন্মরুগ্নী। তুলে ধরতে উলে যাচ্ছেন। জগতের কোনো কম্মে যদি লাগে।

বল, তবু বল একবার শুনি—

শশী দুখানা গামছাই দেয়ালে পোঁতা দুটো পেরেকে আটকে আটকে ঝুলিয়ে দিয়ে মুখটা বাঁকিয়ে বলে, ইহ- সংসারে নেয্য কথা তো বড় শুনতে পাইনে। কোন চুলো থেকে যে একখানি রঙের রাধা নিয়ে এনে সংসারে ভর্তি করেছিলে!

নিবারণী ক্রোধের গলায় বলেন, আমি এনেছিলাম খুঁজে পেতে ? তোর বড়দা তখন বড্ড হিতুষী মুরুব্বী হয়ে নিজের শালী ঝিকে এনে বিয়ে দেওয়ালো না ? মেয়ে যে রাঙের রাধা সে কথা ওর জানা ছেল না ? আমি যাই ভাল মানুষের মেয়ে তাই ওই রুগ্নী মরুনীকে নিয়ে ঘর করছি ; অন্য মা হলে ওই নস্‌তে সলতে বৌকে নিব্বাসন দিয়ে ছেলের আবার বিয়ে দিতো।···গলাটা বেশ চোস্ত করেই বলেন নিবারণী, যাতে শুধু বৌ-ই নয়, বাড়ির অন্যেরাও শুনতে পায়। আবার অদূরে কার পায়ের শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি চোখে আঁচল চাপা দেন। তা আমার আবার অস্থার। আজন্ম পরের গলে গেরো হয়ে পড়ে আচি, বাপের কুলে পযান্ত একটা মশামাছি অব্দি নেই। কোন মুকে বলবো, ওগো এই আমার ইচ্ছে, এই আমার সাধ—

থাক থাক—আর ঘ্যান ঘ্যান করতে হবে না। শশীকান্ত একটা জলচৌকী টেনে নিয়ে বসে পড়ে বলে, কিছু গিলতে টিলতে পাওয়া যাবে ? না হরিমটর ?

নিবারণীর হাতে একটা গোবরজল গোলা ঘটি, থানের খুঁটেয় এতোগুলি ঘুঁটের বুচি, নিবারণী ওই গোবরগোলা জল একটু দালানে ছিটিয়ে দিয়ে হাত বুলিয়ে মুছে নিয়ে হাঁক পাড়েন, কই গো নবাবকন্যে, হতভাগা গরীবটার ভাগ্যে কিচু জুটবে, কি জুটবে নি ?

অশ্রুমতীর হৃৎস্পন্দন স্থির হয়ে আসে।

কিন্তু অশ্রুমতী কী করবে ?

সে কি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে কলসী-হাঁড়ি নেড়ে মুড়ি নারু ঢেলে নিয়ে আসবে ? উঠোনের মাচার গাছে তো অগুন্তি শশা ঝুলছে। মুড়ির সঙ্গে নারকেল কি শশা না হলে শশীকান্ত রেগে আগুন হয়, কিন্তু অশ্রুমতী কি নিজের বরের জন্যে গাছ থেকে শশা ছিঁড়ে নিয়ে এসে ছাড়াতে বসবে ?····

আরো পাঁচজন খেতে জুটলে তবু হাত পা বার করা যায়, এ যে

বেঁধে মায়া। জলখাবারের পত্তন পড়তে এখনো দেরী আছে, শশীকান্তের যদি মাথায় জল দেওয়ার কারণে পেটে আগুন জ্বলে ওঠে, তার জন্যে তো গেরস্ত প্রস্তুত নেই।

অশ্রুমতী অশ্রুধারায় ঝাপসা চোখে ভাবে—শাশুড়ী তো জানেন সবই, তবু ছেলের সামনে বৌকে দোষী করছেন কেন? এসে না হয় দেখে যান অশ্রুমতীর অবস্থাটা কী? স্রেফ ভিখারিনীর মূর্তিতে তো ভাঁড়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সে ভিক্ষাপাত্র হাতে।

ভিক্ষাপাত্রই। শশী যে বেতের ধামিটায় মুড়ি খায়, সেটাই অশ্রুমতীর হাতে। অশ্রুমতী অস্ফুটে একবার আপন আর্জি পেশ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে। জলখাবারের গিন্নী ছোট খুড়-শাশুড়ী ননীবালা স্নান সেরে এসে লক্ষ্মীর দেয়ালের সামনে আহ্নিকে বসেছেন। অশ্রুমতীর অস্ফুট আবেদনে একবার ফিরে তাকিয়ে 'অপেক্ষা' করতে ইসারা করে আবার চোখ বুজেছেন। কে জানে কখন খুলবেন!

প্রতিটি মুহূর্ত এক একটি প্রহর।

অশ্রুমতী কি আর একবার ডাকবে?

গলা দিয়ে শব্দ বেরোবে?

তাহলে কি ও ঘরে গিয়ে অবস্থাটা বলে আসবে? কিন্তু নড়বে কেমন করে? মাটির সঙ্গে তো পুঁতে গেছে অশ্রুমতী নামের মেয়েটা।

শালার সংসারের ক্যাঁথায় আগুন।—

শশীকান্ত চৌকীটা ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, পেটের মধ্যে খাণ্ডবদাহন হচ্ছে, ভিজে মাথা শুকিয়ে পিত্তি পড়ে গেল, একমুঠো মুড়ি গুড় জুটল না? তুমিই বা গোবর জলের ঘটি ধরে সঙের মতন দাঁড়িয়ে আছো কেন নবাব নন্দিনী গর্ভধারিণী? শশেকে খাটে চড়িয়ে পাঠিয়ে দিয়ে ছড়া গোবর দেবে বলে?

দুগ্‌গা দুগ্‌গা! ষাট ষাট!

নিবারণী চোখ মুছে দুগ্‌গাকে স্মরণ করে ষাট বাঁচিয়ে বলেন, ষাভা অকতা কুকতা তোর মুকে।...

তা যেমন মা, তার তেমনি ছা। কেন তুমি একবার দেখতে যেতে পারছ না, তোমাদের ভাঁড়ারে আগুন লেগেছে কিনা।

নিবারণী বেজার গলায় বলেন, আমি এখন ভাঁড়ারের পৈঠেয় উঠবো? না চান, না কিছু।

ছোটগিন্নীর এলাকা দালানের ও প্রান্তে হলেও শশীর ডাক-হাঁক কানে যাবে না, এতো ধ্যানস্থ হয়ে যান নি ছোটগিন্নী। এখন তিনি গলা তুলে বলে ওঠেন, তা ভাঁড়ারে আগুন লাগতে অধিক দেরীও নেই বাছা—বংশে যখন তোমাদের মতন মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে। তা এ ঘরে হাপসা কেন বাছা, নেয্য জায়গায় এসে বোস না। চন্দর বেড়িয়ে ফেরেন নি, তাই মায়ের পায়ে মুণ্ডুটা একটু ঠুকতে বসেছিলুম।...আসবে? না বৌয়ের হাতে দিয়ে দেব?

কি মনে করে শশী কোঁচার খুঁটটা টেনে এ দালানে এসে বসে। এখানে তিন-চারখানা পিঁড়ি পাতাই আছে। কাঁঠাল কাঠের ভারী পিঁড়ি, কোণে কোণে নক্সা কাটা। তার একটায় বসে পড়ে ঘাড় গুঁজে বলে, খিদে লেগেছে তাই বলা—

তা খিদে তো নাগতেই পারে—

ছোটখুড়ির অমায়িক গলা—বেলা তো কম হয় নি। কই নতুন বৌমা, পাত্তরটা!

চকচকে পিতলের কলসীতে মুড়ি ভেজে গরম বেলায় ভরা থাকে। ততোধিক চকচকে একটা পিতলের রেক-এ হড়হড় করে মুড়ি ঢেলে শশীর সামনের ধামিতে ঢেলে দেন ননীবালা, আর এক ছোট্ট ঘড়া থেকে বার করে আনেন ছোলা মটর ভাজা, এবং একটা ছোট কাঁসার রেকাবিতে করে চারটে নারকেল নাড়ু বসিয়ে দিয়ে যান।

কৃতজ্ঞতায় বিগলিত শশী বলে, তিলের নাড়ু আছে নাকি ছোট খুড়ি?

আছে বোধহয় দু'টো, দেখি—

আবার ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে যান ননীবালা, আর ডেকে বলে যান, মাচা থেকে দুটো শশা ছিঁড়ে আনো না নতুন বৌমা, শশী মুড়ির সঙ্গে ভালবাসে—

এবার কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হবার পালা অশ্রুমতীর।

ছোটগিন্নী মুখে যতই ব্যাজার ভাব দেখান, কাউকে খাওয়াতে বসলে যত্ন না করে পারেন না। বলতে কি, স্বেচ্ছায় তিনি এই জলপানির ভারটি নিজের হাতে নিয়ে রেখেছেন।···খানিক বেলায় মুনিষরা আসে, গোয়ালের চাকরটা আসে, গরুর রাখাল আসে, বাসনমাজা ঝি আর তার নাতিটা আসে, সব্বাইকার জলপানি বরাদ্দ।—

ওদের জন্যে অবশ্য মোটা চালের চাল ভাজা। তবে সেই চাল ভাজার সঙ্গে আনুষঙ্গিকও আছে। বাটি বাটি গুড়, ব্যাসন নাড়ু, পক্‌কাম্ন, তেল নুন কাঁচা লংকা।—গাছের শশার বহর দেখলে তাও ছিঁড়ে নিতে বলেন। আর কেউ ওদের পরিবেশন করলে পছন্দ হয় না ননীবালার।

দ্বিতীয় প্রস্থ মুড়ি আর তিলের নাড়ু খেয়ে বড় গেলাসের এক গেলাস জল খেয়ে শশী পরিতৃপ্তির শব্দ উচ্চারণ করে গলা তুলে বলে, আমি একটু চণ্ডীবাড়ির ওদিকে যাচ্ছি ছোট-খুড়ি, কেউ খোঁজ করলে বলে দিও।

কেউ অর্থে অবশ্যই চন্দ্রকান্ত।

কিন্তু চণ্ডীবাড়ি কি গুপ্তদের দোতলার শেষ কোণার ঘরে!

ছেলের বৌকে অকারণ খিঁচিয়ে নিবারণী চাপা গলায় বলেন, খবরদার। কাউকে নাগিয়ে দিতে যাবি না হারামজাদি যে, শশে ওপরে ঘুমোতে গেচে :—বুঝতে পেরেচিস? ঘুমে বাছা নটপট করছে, একটুক্ষ্যাণ ঘুমোতে না পেলে বাঁচবে কেন? —নাগিয়ে যদি দিস, তোর একদিন কি আমার একদিন। —যাও এক ঘটি জল নে গে

রেখে এসো ওর মাতার কাচে, তেষ্টা পেলে গলা তুলে ডেকে চাইতে পারবে নি তো। আহা, বাছা আমার যেন চিরচোর! বাপ নেই বলেই তো? আজ যদি ওর বাপ থাকতো, কারুর সাদ্যি ছেলো চোক রাঙাতে? পরাশ্রয়ী তো নয়? নিজের বাপ দাদার ভিটে, শুধু দুটো ভাত কাপড়। তার জন্যেই এতো নীচু হয়ে থাকা। — সঙের মতন দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও। আসার সময় কপাটটা ভেজিয়ে দে এসো। আর এই বলে রাকচি, খবরদার, যেন কেউ টের না পায় শশে ঘরে আচে।

শশী ভূমিষ্ঠ হবার আগে ওর বাপ মরেছিল, তবু নিবারণী ওর বাপ থাকা আর না থাকার অবস্থার তুলনা-মূলক আলোচনায় আক্ষেপ করতে ছাড়েন না।

শশীকান্ত যে ঘরটা অকাল নিদ্রার জন্যে বেছে নিয়েছিল, সেটা বলতে গেলে বাড়ির বাড়তি আবর্জনার ঘর। ভাঙা। ভাঙা টুল, নড়বড়ে আলনা, তুলো বেরিয়ে যাওয়া তোষক, ছেঁড়া মশারির ডাঁই, পুরনো কাপড়ের পোঁটলা ইত্যাদি। একটা যে ইঁট-ঠেকানো তেপায়া চৌকী পড়ে আছে, সেও জঞ্জাল হিসেবেই, তবু তার ওপর কিছু তোষক বালিশও আছে ওই রাখার জন্যেই।—এটাই শশীর সুখের ষোলোকলা। যখনই বাড়িতে থেকেও গা-ঢাকা দেবার তাল করে শশী, এইখানে এসে শুয়ে পড়ে। সন্দেহের অতীতই জায়গাটা।

আর প্রধান সুবিধে—প্রবেশ পথটা লোকচক্ষুর অন্তরালে। দালান ছাড়িয়ে ঘেরা বারান্দার কোণে।

জলের গ্লাশটা নিয়ে ঘরে ঢুকল অশ্রুমতী।

মোটা একটা ময়লা তেলচিটে ওয়ারবিহীন পাশ-বালিশ জড়িয়ে

শুয়েছিল শশী। দরজা খোলার শব্দে চমকে 'কে' বলেই উঠে বসে খিঁচিয়ে বলে উঠল, আবার কী করতে জ্বালাতে এলি?

পিসির কানে শশীকান্তর স্ত্রীর প্রতি মধুর সম্বোধন গেলে রাগ করে পিসি বলে, বদ্যির ঘরের ছেলে, পরিবারকে 'তুই মুই' কী রে? তুমি বলতে মুখে ফোস্‌কা পড়ে?

অতএব শশীকান্ত লোক সমাজে একটু সামলে চলে। কিন্তু একা কোর্টে পেলে সামলাবার প্রশ্ন নেই। এমন সুবর্ণ সুযোগে তুই তো সামান্য, পিটিয়ে লাশ করাও চলে।

অশ্রুমতী ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, মা বললেন জলটা—ওর বেশী সাহসে কুলোয় না তিন ছেলের মা অশ্রুমতীর। 'ছেলে' অবশ্য নয়, মেয়ে। জন্ম-রুগ্ন-হাড়সার তিনটে মেয়ে। যারা অশ্রুমতীর দুঃখের বোঝা আর পরাজয়ের স্বাক্ষর। তাই সাহসের প্রশ্ন নেই।

শশীকান্ত হাত বাড়িয়ে বলে, এদিকে আয়।

ওঃ। সরে এসে মারবার পরিশ্রমটুকুও করবে না। পায়ে হেঁটে গিয়ে মার খেতে হবে।—এগিয়ে গেলেই যে নির্ঘাৎ গালে ঠাস করে একটা চড় মারবে তাতে সন্দেহ কী?

অশ্রুমতী নড়ে না।

অথবা নড়তে পারে না।

কী? ন্যাকামি হচ্ছে? চুলের মুঠি ধরে টেনে আনতে হবে? —শশীকান্তর ভঙ্গী হিংস্র ক্ষুধার্ত।

অশ্রুমতীর সর্বশরীর থরথরিয়ে আসে, অশ্রুমতীর বুক ধড়কড় করে ওঠে, চোখে জল উপচে ওঠে, এক পা এক পা করে এগিয়ে যায় অশ্রুমতী আসন্ন ঝড়ের মুখে।—ভগবান।—ঘাড়ে পিঠে বুকে পেটে যেখানে হয় মারুক, যেন গালে না মারে। বড় লজ্জা! বড় লোক জানাজানি! লুকোবার উপায় নেই। তিন চারদিন কালসিটের দাগ থাকে।

ভগবান বোধয় বেচারী অশ্রুমতীর প্রার্থনা শুনতে পান।

গালে চড় বসিয়ে দেয় না তার পতি দেবতা।

কিন্তু ঠাশ করে গালে একটা চড় বসিয়ে দেওয়া কি এর থেকে বেশী ভয়াবহ ছিল?—

কিছুক্ষণ পরে যখন 'দূর হ কাঠের পুতুল' বলে অশ্রুমতীর রোগা শরীরটা চৌকী থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আবার গুছিয়ে ঘুমের জোগাড় করে শশীকান্ত, তখন তার হাতের মুঠোয় অশ্রুমতীর গলার সরু বিছে হার ছড়াটা।

কষ্টে কান্না থামিয়ে অশ্রুমতী বলে, গলা খালি দেখলে সবাই কী বলবে?

কী আবার বলবে? খানিক গাল-মন্দ করবে। তা'পর থেমে যাবে।

জিগ্যেস করবে না কোথায় গেল?

করবে নিশ্চয়। বলবি চান করতে গিয়ে টিপ্‌কল খুলে জলে পড়ে গেছে।

আস্ত রাখবে আমায়?

না রাখে, ভাঙবে। যাকে দিয়ে এতটুকু সুখ নেই, অমন পরিবার থাকাই বা কী, যাওয়াই বা কী? নিজেই জলে ডুবতো না। লোকে ভাববে গয়নাসুদ্ধ ডুবেছে।

মেয়ে তিনটেকে কেউ দেকবে জানলে এক্ষুনি জলে ডুবতে যেতাম। তোমার মা তো ওদের কাঠি করেও ছোঁন না।

অ্যাঁ! কী বললি?

মাতৃভক্ত শশীকান্ত মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বৌয়ের ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলে, আমার মা তুলছিস?—মায়ের কথা নয়ে কথা?—জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব না? ফের বলবি? ফের বলবি? যা বেরো দূর হয়ে যা।—স্বামী তোর একটা সোনা নিয়েছে বলে হাপসাচ্চিস? লজ্জা করে না? নিয়েছি তোর সাতপুরুষের ভ্যাগ্যি তা জানিস?—স্বামীর

কোনো কম্মে লাগিস খ্যাংরা কাঠি! অ্যা লাগিস? তিনতিনটে মেয়ে বিইয়ে আমায় উদ্ধার করেছেন। হার নিয়েচি বেশ করেচি। কাউকে যদি বলবি, তো তোর ওই অরিস্টি-গরিস্টি-পাপিষ্ঠী মেয়ে তিনটেকে খালের ধারে গুঁজে রেখে আসবো। বাস, আমার এই শেষ কথা।

এই এক মোক্ষম অস্ত্র।

একেবারে ঠাণ্ডা করে দেওয়া যায়।

অশ্রুমতী নামের মেয়েটা এই অস্ত্রে একেবারে নিথর!—মেয়ে কটা তার প্রাণ। সেটা বোঝে বলেই শশী এই অস্ত্রটাই শানিয়ে রাখে।

'হিতবাদী' তো তোমার 'কাব্যকণিকা'র খুব প্রশংসা করেছে।—নিয়ে এলাম কাগজখানা—

হাতের কাগজখানা ফরাসের উপর বিছিয়ে ধরে গৌরমোহন। সেই মুদ্রিত জায়গাটিতে আঙুল ঠেকিয়ে বলেন, 'হিতবাদী' বড় একটা এরকম ছাপে না। যাক—ভাই, তুমি একটা কাজের মত কাজ করে চলেছ!

চন্দ্রকান্ত সেই কলামটার উপর চোখ রেখে লজ্জিত হাসি হেসে বলেন, কাজের মত কাজই বটে! ছেলেখেলা করি একটু।—তুমি জোর করে খাতাটা নিয়ে গিয়ে এই কাণ্ডটি করেছিলে, তাই হল। আমার তো জমাই হচ্ছে কেবল।

খুব অন্যায়। এসব জিনিস ছাপা হওয়া দরকার। 'ছেলেখেলা' হলে আর কাগজে সুখ্যাতি করতো না—

গৌরমোহনের কণ্ঠে উৎসাহ উদ্দীপনা আনন্দের অভিব্যক্তি।

এই তো দেখো না, 'কাব্যকণিকা'র কবিতাগুলিকে 'কণিকা' মাত্র

বলা কবির অধিক বিনয়ের লক্ষণ। দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি যথার্থই আন্তরিক আবেগপ্রসূত।—সমাজচিন্তা সম্পর্কিত কবিতাগুলিতে যেমন সমাজের অনাচার-অত্যাচারের উপর তীব্র কশাঘাত আছে, তেমনি আবার কবির দরদী হৃদয়ের বেদনাবোধের স্পর্শ আছে।—'জননী' কবিতাটিতে কবির চিন্তার স্বচ্ছতা, বক্তব্যের ঋজুতা ও সুগভীর অনুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা একটি স্তবক উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না—

হে জননী—
তুমি কি কেবলই রবে 'স্নেহময়ী' রূপে
শুধু সহ্য শুধু ক্ষমা,
শুধু স্নেহ শুধু মায়া
অক্লান্তে সেবিয়া যাবে, ধীরে
চুপে চুপে ?
হবে না কি 'অগ্নিময়ী' কঠোর ?
অপদার্থ কুসন্তানে—
কঠিন আঘাত হেনে—
ঘুচায়ে দিবে না তার 'কাল' ঘুমঘোর ?

স্থানাভাবে অধিক উদ্ধৃতি সম্ভব হইল না, তবে কবি জননীর যে আদর্শ রূপ কল্পনা করিয়াছেন ও তাঁহাদের যে কর্মপন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা যুগোপযোগী হইয়াছে।

চন্দ্রকান্ত অল্প বয়স্ক নয়, চন্দ্রকান্তর প্রকৃতিতে গৌরমোহনের মত উচ্ছ্বাস নেই, তবু চন্দ্রকান্তর বুকের মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে, যেন একটা বেদনার মত আনন্দ বোধ হয়।

তবু চন্দ্রকান্ত মৃদু হেসে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেন, এই সমালোচকটি তুমিই নও তো ?

কী যে বল ?

গৌরমোহনও হাসেন, আমি কে যে আমার বক্তব্য ছাপবে ?

তবে হ্যাঁ, প্রকাশের জন্যে দেওয়ার বাহাদুরীটা গৌরমোহনের প্রাপ্য। এবারেও তোমার কিছু কবিতা নিয়ে যাব। জমেছে তো কিছু?

চন্দ্রকান্তর মুখে আসে, এখন আমার কবিতার থেকে গদ্য রচনায় ঝোঁক হয়েছে,—লজ্জায় বলে ফেলতে পারেন না শুধু হেসে বলেন, তা জমেছে। যাক, থাকছ কতদিন?

কতদিন আর? মাত্র তো সাত দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি।

চন্দ্রকান্ত বলেন, কলকাতার অবস্থা এখন কী রকম?

গৌরমোহন একটু তাকিয়ে বলেন, কোন্ অবস্থার কথা জানতে চাইছ? অর্থাৎ কোন্ বিষয়ে?

সব বিষয়েই। শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম, সামাজিক আচার-আচরণ, নব্য যুবকদের মতিগতি, স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগামিতা—

ওরে বাবা! তোমার 'কোশ্চেন পেপার' পড়তেই তো আমার একটা বেলা কেটে যাবে। সব অ্যানসার দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবও নয়, এক কথায় বলা চলে—কলকাতা হচ্ছে বহুরূপী। —একই মাটিতে একদিকে ধর্মের বন্যা, অপর দিকে পাপের স্রোত, একদিকে শিক্ষা সভ্যতা কালচারের অগ্রগতি, অপর দিকে সভ্যতার নামে অসভ্যতা, শিক্ষার নামে বিভ্রান্তি। আর স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা যদি বলো—আচ্ছা চন্দর—

গৌরমোহন ব্যগ্রভাবে বলেন, তুমি একবার চলো না। কতকাল তো যাওনি। সেই অবধিই তো কলকাতাকে বর্জন করে বসে আছো।

চন্দ্রকান্ত গৌরমোহনের কথায় চকিত হন। তারপর আস্তে বলেন, ওটা কোন কথা নয়। বর্জনও নয়, তদবধিও কিছু নয়। যাওয়া হয়ে ওঠে না। এই পর্যন্ত।

চুপ করে যান দু জনেই। যেন অতীত স্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়ে অবগাহন করেন।

একটু পরে চন্দ্রকান্ত গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলেন, তুমিতো সবই

জানো। বড়দারা আলাদা হয়ে যাওয়ার পর থেকে আমি বড়ই বন্দী হয়ে গেছি। বাড়িতে তো আর দ্বিতীয় পুরুষ অভিভাবক নেই। অথচ—

গৌরমোহন বলেন, শশীকান্ত এখনো মানুষের মত হল না?

হলে আর ভাবনা কী ছিল? বরং মনে হচ্ছে, বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে দুর্মতি বাড়ছে। সেজ খুড়ির অদৃষ্ট। এই সব বন্ধনে—

তাহলেও—

গৌরমোহন বলেন, একবার চলো কয়েকটা দিন থেকে আসবে। মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীটের সেই আগের বাসাটা বদল করেছি সে তো জানো? শোভাবাজারের এই বাসাটা অনেক বড়, অনেক জায়গা। বড় বড় পাঁচখানা ঘর, দালান উঠোন। তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।

চন্দ্রকান্ত অন্যমনা ভাবে বলেন, আমার আবার কী অসুবিধে? কেষ্টর মায়ের অসুবিধে ঘটানো—

কৃষ্ণমোহন গৌরমোহনের বড় ছেলে, ডাকনাম কেষ্ট। গৌরমোহন ব্যস্ত হয়ে বলেন, আ ছি ছি। এ কী বলছ চন্দর? কেষ্টর জননী মানুষজন খুব ভালবাসে। রান্নায় খুব ওস্তাদ তো। খাওয়াতে টাওয়াতেও—

গৌরমোহনের কথার মাঝখানেই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। বাড়ির ভিতর থেকে গোবিন্দ দুহাতে একটি থালা ধরে নিয়ে এসে দাঁড়ায়। নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্ন থালা বোঝাই।

চন্দ্রকান্ত শিহরিত হন। কী সর্বনাশ, এতো কে খাবে?

তুমিই খাবে। সকাল বেলা তো সেই শুধু সরবৎ খেয়ে বেরিয়েছ?

একথা কে বলল তোমায়?

বাঃ। চিরকাল যা কর জানি না? অভ্যাসের নড়চড় করবার লোক তো তুমি নও। খাও খেয়ে নাও। আমি তো ভাবছিলাম,

গোবিন্দকে একবার তোমার বাড়ি পাঠিয়ে দিই। পিসিমাকে বলে আসুক, আজ তুমি এখানেই সারাদিনটা থাকবে খাবে।

না, না।

চন্দ্রকান্ত ব্যস্ত হন, এসব আবার কেন?

আর কিছু নয়, অনেক কথা জমে আছে, মনে হচ্ছে সারাদিনেও ফুরোবে না। যাক না গোবিন্দ—

চন্দ্রকান্ত অবশ্য অনুরোধ কাটিয়ে নেন।

বন্ধু গর্বে যাতে আঘাত না লাগে গৌরমোহনের, এমন কোমল ভাবেই বলেন, পিসিমার ছুতোও দেখান, তবু গৌরমোহন একেবারে ছাড়েন না। কথা হয়—তাঁর এই ছুটির কদিনের মধ্যে একটা দিন দুই বন্ধুতে একসঙ্গে ভাত খাওয়া হবে।

চন্দ্রকান্ত হেসে বলেন, সেটা আমার বাড়িতেই বা নয় কেন? না কি বস্তি বাড়িতে চলবে না?

গৌরমোহন হেসে ফেলে বলেন, চিরকালইতো চলে এলো, হঠাৎ প্রশ্ন কেন? পিসিমার হাতে খেয়ে খেয়েই তো মানুষ হয়েছি—ঠিক আছে, একটা দুপুর তাও হবে। বামুনের ছেলে, পেটুক জাত, ভোজনে ব্যাজার নেই। তবে এ বাড়ির গিন্নীরও সাধটা মেটানো চাই। বামনাইয়ের কথা আর তুলোনা ভাই, কলকাতায় বসবাস করতে গেলে জাতের বড়াই করা ধৃষ্টতা। তাছাড়া—কেষ্টর মায়ের শরীর খারাপ হওয়ায় বাড়িতে তো রাঁধুনী বামুনেরও আমদানী করতে হয়েছিল, উড়িষ্যার মাল, পৈতে একটা গলায় ছিল, ওতেই সন্তুষ্ট থেকেছি। গিন্নী ভাল হয়ে অবশ্য তাকে ভাগালেন।

কী হয়েছিল গিন্নির?

অন্যমনস্ক ভাবে বললেন চন্দ্রকান্ত।

গৌরমোহন একটু লজ্জিত হাসি হেসে বলেন, আর বল কেন, বুড়ো বয়সের কেলেংকারী।

তাই না কি?

চন্দ্রকান্ত একটু সচেতন হলেন।

গৌরমোহন বলেন, টি'কল না, শুধু কষ্টই সার হল। অসময়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার বাড়তি ফল ওই স্বাস্থ্য ভঙ্গ। তুমি বেশ আছ ভাই, নীলকান্তর পর চুপচাপ। আমার তো ত্যাখো তুই মেয়ের পর কেষ্ট, লালু, এই গোবিন্দ, আর ওইতো শুনলে—

চন্দ্রকান্ত একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলেন, নীলকান্তর জন্মের আগেরগুলিকে বুঝি হিসেব থেকে বাদ দিচ্ছো?

আহা। ঈস্! ইয়ে—মানে—

গৌরমোহনের মুখটা অপ্রতিভ অপ্রতিভ লাগে।

ভুলেই গিয়েছিলেন সত্যি।

চন্দ্রকান্তের প্রথম পুত্র-সন্তানটি আঁতুড় ঘরেই মারা যায়।

ধাইয়ের মতে পেঁচোয় পেয়েছিল, সুনয়নীর মতে—ধাইয়ের অসাবধানতায় হাত থেকে পড়ে গিয়ে তড়কা হয়েছিল।

দ্বিতীয়বার সুনয়নী আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন যমজ কন্যা নিয়ে। এটা অনেকের কাছেই খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল। ভগবান একজনকে অকালে নিয়ে ফেলে অনুশোচনায় পড়ে একসঙ্গে তুটিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। চিরকেলে পাকা কথা কইয়ে সুনয়নী অবশ্য বলেছিল, হ্যাঁ খুব পুণ্যি করেছেন ভগবান, নাকের বদলে নরুণ দিয়েছেন।

তবে কন্যা যুগলের আদরের ঘাটতি ছিল না, কারণ মেয়ে তুটি হয়েছিল পরমা সুন্দরী। কিন্তু সেটাই হল কাল, সুনয়নীর বাপের বাড়ির দিকের এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় তাঁর একজোড়া যমজ ছেলের জন্য মেয়ে তুটিকে পছন্দ করে ফেলে এমন ঝুলে পড়ল যে নিতান্ত বালিকা বয়সেই তাদের গোত্র ছাড়া করে ফেলতে বাধ্য হলেন চন্দ্রকান্ত। তখন অবশ্য চন্দ্রকান্তর বাবা বেঁচে।

চন্দ্রকান্ত এই বিপদ থেকে উদ্ধার হতে তাঁর শরণ নিয়েছিলেন।

তিনিও এতে খুব উৎসাহী ছিলেন না। যমজ পাত্র পাত্রীর বিবাহ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পূর্ণ অনুমোদিত নয় বলেই স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠল কুটুম্বুর মর্যাদা রক্ষার।

বিয়ের প্রস্তাবক-কর্তা স্বয়ং সুনয়নীর বাবা, অতএব চন্দ্রকান্তরও পিতৃতুল্য গুরুজন, তাঁর একান্ত নির্বেদ সত্ত্বেও অরাজী হওয়া মানেই তাঁকে অসম্মান করা।

সুনয়নী তো একেবারে বাপের দিকে। তার মতে, একসঙ্গে একজোড়া কন্যাদায় উদ্ধার হয়ে যাওয়ার এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়ছেন এঁরা কেবলমাত্র প্রস্তাবটা গরীব কুটুম্বর কাছ থেকে এসেছে বলে! বাবার এতে মুখ থাকবে? এই সুনয়নীর নিভৃত-রাত্রির পটভূমিকা হলো—আমার বাবা গরীব, কিন্তু একটা মান্যমান লোক। তাছাড়া—পাত্রপক্ষ তো মস্ত বড় লোক। তোমরাই তাদের কাছে ম্যাড়মেড়ে হয়ে যাবে।

তা সেটাই বা কি লাভ?

বলি মেয়ে তো সুখে থাকবে।

তুমি পারবে এখন থেকে ওদের ছেড়ে থাকতে?

সুনয়নীর পাকা গিন্নী কথা, তা মা যখন হয়েছি, এ দুঃখ তো সইতেই হবে। আজ দশ বছরের আছে, কাল বারো বছরের হয়ে উঠবে। মেয়ের বাড় কলা গাছের বাড়। এরপর ওই মেয়েদের নিয়ে ভুগতে হবে কিনা তা দিব্যি গেলে বলতে পারো? যমজের আধখানা লোকে সহজে নিতে চাইবে? আর এ সম্বন্ধ যদি তোমরা হেলায় ঠেলো, বাবা আর তোমাদের বাড়ির ছায়াও মাড়াবেন না তা মনে রেখো।

চন্দ্রকান্তর বাবা বললেন, এরকম ক্ষেত্রে রাজী হওয়া ছাড়া উপায় দেখি না চন্দর। বৌমার যুক্তিটাও ফেলবার নয়, এরকম সর্বদিকে ভাল পাত্র সব সময় পাওয়া যায় না, মেয়েরা না হয় দুবছর এখানেই থাকবে—

অতএব পিতৃশরণ নেওয়াও কাজে লাগেনি চন্দ্রকান্তর। কিন্তু সেই সর্বাংশে ভাল পাত্রের পিতাটি যে সর্বাংশেই খারাপ তা বোঝা গেল বিয়ের পরে।

দু বছর তো দূরস্থান, দুদিনও বৌদের বাপের বাড়ি রাখতে রাজী হলেন না তারা। সেটা নাকি তাঁদের কুলগত নিয়মের বহিভূ্ত।

আগে এ নিয়ম জানানো হয়নি কেন এ প্রশ্নে কিছু বচসা হল, এবং সেই সূত্রে চিরতরেই আসা বন্ধ হয়ে গেল মেয়েদের। পাঠাতেই যদি হয় জন্মের শোধই পাঠাবেন, এমন ঘোষণা পত্র পাঠালেন তারা। চন্দ্রকান্ত অবশ্য বলেছিলেন বাপের কাছে, তাই পাঠাক। জন্মের শোধই পাঠাক।

বয়েস তখন কম, রক্ত তপ্ত। এই সিদ্ধান্তই নেবেন স্বাভাবিক। কিন্তু চন্দ্রকান্তর ঠাণ্ডামাথা বাবা বললেন, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। নিজেদের জেদের লড়াইয়ে মেয়ে দুটোর— আখের ঘোচাবি বাবা? একটা আধটা নয়, দু-দুটো মেয়ে। তাদের চিরকালের কথাটা ভাব। তুই নাহয় তাদের ভাত কাপড় দিতে পারবি, কিন্তু স্বামী সংসার দিতে পারবি?

চন্দ্রকান্ত মাথা হেঁট করলেন।

অতএব নাটকে যবনিকা পতন।

মজা এই যে, কুটুম্ব বিচ্ছেদের ভয়ে এই ঘটনা ঘটানো, এ-ব্যাপারে সেই বিচ্ছেদই ঘটলো। সুনয়নীর বাবা এতে জামাইয়ের দোষ দেখে তারপর আর এ বাড়িতে পদার্পণ করেন না। ক্রমশঃ যেন ভুলেই গেল সবাই, ফুলি টুলি নামে টুকটুকে দুটো মেয়ে এ বাড়িতে ছিল।

অনেকদিন পরে কোথায় কোন মেলায় না মন্দিরে নাকি মেয়েদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিলেন সুনয়নী, মেয়েরা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে শাশুড়ির পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অতঃপর আর কি হতে পারে?

গৌরমোহনের এ ইতিহাস জানা।

দৈবাৎ ভুলে গিয়েছিলেন, তাই চন্দ্রকান্তের সন্তান সংখ্যার উল্লেখ করে ফেলেছিলেন। এখন অপ্রতিভ হলেন।

চন্দ্রকান্ত বললেন, লজ্জা পাবার কিছু নেই ভাই, আমরাই তো প্রায় ভুলে গেছি তাদের। নীলকান্তর জননীর আচার আচরণ দেখলে তো মনে হয় না, নীলকান্ত ছাড়া আর কখনো কেউ ছিল ওর।

স্ত্রী সম্পর্কে 'মা' শব্দটাই উচ্চারণ নিষেধ, তাই 'জননী' বলেই কাজ সারতে হয়।

চন্দ্রকান্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার বলেন, আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ কি জানো গৌর, যে আমি বাল্য বিবাহের এতো বিরোধী, সেই আমারই মেয়েদের বিয়ে হল বলতে গেলে শিশুকালে। অথচ এমনিতেই এখন নানা কারণে বাল্য বিবাহ কমে আসছে। শুধু দুঃখ নয়, লজ্জাও। বড় লজ্জা।

হঠাৎ আবার একটা স্তব্ধতা নামে।

এবার তাহলে উঠি গৌর।

একটু পরে বলেন চন্দ্রকান্ত।

আচ্ছা এসো, আমিও যাব পিসিমার সঙ্গে দেখা করতে। কাল দুপুরের কথা বলে আসবো। তুমি আর নীলকান্ত—

নীলকান্ত? না না। ওটা থাক।

চন্দ্রকান্তর কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

গৌরমোহন বিস্মিত হন, কেন বল তো?

না এমনি, মানে তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

চন্দ্রকান্ত উঠে পড়েন।

যাবার মুখে বলে যান, মনের কথা বলবার মত লোক জগতে বড় দুর্লভ গৌর।

কথাটা সত্যি। চন্দ্রকান্ত তাঁর সেই সামাজিক উপন্যাসের পরিকল্পনার কথা বলতে চান গৌরমোহনকে। বলতে চান পরামর্শের জন্যেও। বর্তমানকে নিয়ে লেখা সহজ, অতীতকে নিয়ে আরো সহজ, কিন্তু ভবিষ্যৎকে নিয়ে? তাতে পদে পদে চিন্তার প্রশ্ন। কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিলে তো চলবে না। 'রূপকথা' না হয়ে যায়।

এসব কথা নীলকান্তর সামনে হতে পারে না। সেই নিয়ে মায়ের কাছে গল্প করতে বসবে। এমনিতে নেমন্তন্নতেই ভয়। ছেলে কোথাও নেমন্তন্ন গেলে, কোন খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে গেলে বাড়ি ফেরা মাত্রই সুনয়নী প্রশ্ন করবে, কী খেলি? তারপর তালিকা শুনে হয় সমালোচনা আর ব্যাখ্যানায় মুখর হবে, নয় চোখ কপালে তুলে ধন্যি ধন্যি করে সুনয়নী নিজে কবে কোথায় কী কী 'বড়' নেমন্তন্ন খেয়েছে, তার ফিরিস্তি দিতে বসবে। হয়তো সে ফিরিস্তিতে শুনতে হবে—সুনয়নীর পিসেমশাই একা আস্ত একটা পাঁঠা খেতে পারেন, একটা বিয়ে বাড়িতে এক গামলা মাছ ফুরিয়ে দিয়ে কী জব্দই না করেছিলেন।

অথবা সুনয়নীর মামা একাসনে বসে আড়াই সের বোঁদে আর সাড়ে তিন সেরি দইয়ের হাঁড়ি শেষ করেও আবার পুরোদমে মাছ, লুচি, ডাল, তরকারি খেয়ে কত অনায়াসে হজম করতেন।

প্রসঙ্গ আর ফুরোতেই চায় না।

চন্দ্রকান্তর মনে হয়, কী অরুচিকর এই সব প্রসঙ্গ। চন্দ্রকান্তর চিন্তায় অতিরিক্ত আহার বীভৎসতার সামিল, আর সুনয়নীর মতে সেটা রীতিমত বাহাদুরীর ব্যাপার।···

ছোট মামা না একবার কালীপুজোর পরদিন বাজি রেখে চারচারটি পাঁঠার মুণ্ডু খেয়েছিলেন—জানিস?

চন্দ্রকান্তর কানের কাছেই এ আলোচনা।

উঠে গিয়েছিলেন চন্দ্রকান্ত সেখান থেকে।

যাবার সময় শুনতে পেয়েছিলেন, তোমার ছোট মামা খুব বীর, তাইনা মা ?

নিশ্চয়।

বালক পুত্রের কাছে 'বীরের' ধারণা জন্মানোর এই উপকরণ সম্বল ছিল সুনয়নীর।

কিসের সম্বলই বা আছে সুনয়নীর ? কোথাও কোনোখানে ?

কী নিঃসম্বল ! কী রিক্ত !

অথচ সেই রিক্ততা সম্পর্কে বোধ মাত্র নেই।

চার

বাড়ি ফিরতে রোদ চড়চড়ে বেলা, দুপুর হয় হয়।

সামনের রাস্তা দিয়ে বাড়ি না ঢুকে পিছনের আমবাগানের ছায়ায় ছায়ায় ঢুকবেন বলে উল্টোমুখো রাস্তা ধরে ঢেঁকিঘরের পাশ দিয়ে উঠোনে চলে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন চন্দ্রকান্ত। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে হবে বলে কষ্ট হল।

ঢেঁকিঘরের পাশের এই উঠোনটার মাঝখানেই বড় জেঠিদের পার্টিশনের প্রাচীর। টানা লম্বা সেই প্রাচীরটা ভর্তি করে ঘুঁটে লাগাচ্ছেন সুনয়নী। পচা গোবরের গন্ধে নাক চাপতে হল।

সুনয়নীর চুলগুলো ঝুঁটি করে মাথার চুড়োয় তোলা। সুনয়নীর পরণে একখানা, ও গায়ে একখানা গামছা। সুনয়নীর হাতে গোবর, মুখে ঘাম। সেই ঘাম ভেদ করে ফুটে উঠেছে ত্বকের রক্তিমা। এমনিতে শাঁখের মত শাদা, কিন্তু রোদে হয়ে উঠেছে লাল।

কিন্তু গালের ওই রক্তিমাভা কি চোখে পড়ে চন্দ্রকান্তর? লজ্জায়, ক্ষোভে নিজেই তো রক্তিম হয়ে ওঠেন তিনি।

কী কুৎসিত! কী জঘন্য!

দ্রুত এগিয়ে এসে বলে উঠলেন, ছোট বৌ!

ওমা! ই কি! তুমি এদিকে কোনখান থেকে?

বিব্রত হয়ে গায়ের গামছার খুঁটটা টেনে মাথায় তোলবার বৃথা চেষ্টায় গাটাই আদুল হয়ে যায় সুনয়নীর। বাড়তির ভাগ— গালে কপালে বুকে লাগে গোবরের ছোপ্।

থাক থাক, আর লজ্জায় কাজ নেই—

চন্দ্রকান্ত ক্ষুব্ধ গাম্ভীর্যে বলেন, যথেষ্ট হয়েছে। 'লজ্জা' জিনিসটা

যে কী, সে জ্ঞানই যদি থাকতো! তা এসব করবার লোক জোটেনি? বাগদী বৌ মরে গেছে?

বালাই ষাট মরবে কেন? দিব্যি আছে। রাঁধছে খাচ্ছে। ঘুঁটেগুলো দেবার গা নেই, সাতদিন ধরে গোবরের ডাঁই পচাচ্ছে। আর ফেলে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে।

ওঃ। তাই। তাই তুমি সেই পচা গোবরের সদগতি করতে লেগে গেছ? নিজের থেকেও দামী মনে হল তোমার ছোটবৌ এই পচা গোবরগুলো?

সুনয়নী তখনো মাথা ঢাকবার বৃথা চেষ্টায় গামছার খুঁটটাকে দাঁতে কামড়ে হাত উল্টে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছেন। করতে করতেই বলে ওঠেন, দামী সস্তা আবার কী! গেরস্ত ঘরের বৌ, একটু গেরস্তালীকাজ করলে হাত ক্ষয়ে যাবে? যাও তো ওদিকে, ব্যস্ত কোর না বাবু। কে কোনদিকে এসে পড়বে—

এসে পড়লে তোমায় তো দেখবেই এই মূর্তিতে।

আমায় একলা দেখলে আবার কী। গেরস্ত ঘরের বৌ-ঝি একবারো গামছা পরে না? বেম্ম তো নেই, হিঁদু বাঙালী তো! গাঁ ঘরে বসত।

তা বটে। তাতেই সাতখুন মাপ।

চন্দ্রকান্ত সুনয়নীর ব্যতিব্যস্ত বিব্রত ভাব দেখে আর দাঁড়াল না। এসেই গৌরমোহনের গল্প করবেন বাড়িতে—এই ভাবতে ভাবতে আসছিলেন, ছন্দ কেটে গেল। গল্পটা অবশ্য পিসি খুড়ির কাছেই, তবু সুনয়নী তো থাকতো ধারে কাছে।

বাবা, এতোক্ষণে এলি তুই? কোন ভোরে বেরিয়েছিলি!

পিসিমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। ওখেনে তো জলটল খেয়ে এসেছিস। গৌরের ছেলে বলে গেল।

না খেলে ছাড়বে ?

বলেই চন্দ্রকান্ত ইতস্তত: গলায় বলেন, বাগদী বৌয়ের কী হল পিসিমা ? পচা গোবরের পাহাড় নিয়ে তোমাদের ছোটবৌমা—

ইতস্ততঃ তো করতেই হবে। এখুনি যদি পিসিমা 'বৌয়ের দুঃখে গলে গেলি' বলে সাত কথা শুনিয়ে দেন।

কিন্তু না। উল্টোই হলো।

পিসিমা বলেন, ওই তো ছাখনা ! বললে শুনছে কে ! বাগদী বৌ অবিশ্যি কামাই করছে। কিন্তু তাড়াই বা কী? সাতদিন পচছে। নয় আর একদিনও পচবে। চোদ্দবার বারণ করলাম, তা বলে কি—কাজ পড়ে থাকলে আমার স্বস্তি থাকে না। আমি তো বাবা মরে গেলেও ওই কম্মটিতে হাত লাগাতে যাইনে। তিনদিন তিন রাত্তিরে হাতের পচা গন্ধ যায় না। ছোটবৌমার তো শরীরে ঘেন্না পিত্তির বালাই নেই। যত বলি, ততো হেসেই আকুল হয়।

চন্দ্রকান্ত সরে আসেন।

অভিযোগই করছেন পিসিমা।

কিন্তু সেটাই কি আসল ? তার মধ্যে থেকে কি অপরাধিনীর প্রতি প্রশ্রয়ের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠছে না ? প্রশ্রয়ের আর প্রশংসার ! যে মারণাস্ত্রে সুনয়নী নামের মানুষটা নিহত।

দোতলায় উঠে এসে দেখলেন, নীলকান্ত অভিনিবেশ সহকারে পাখিমারা গুলতি তৈরি করছে। নীলকান্তর হাতে একটা গাছের দু'ডালের মাঝখানের কোনাচে ডাল, শক্ত পোক্ত, আর খানিকটা শক্ত দড়ি। দুটোকে ধরে টেনে টেনে বাঁধছে মজবুত করে।

চন্দ্রকান্ত বিরক্তভাবে নিজের ঘরে ঢুকে যাচ্ছিলেন, কি ভেবে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, আবার গুলতি তৈরি করছো নীলকান্ত? অকারণ জীবহত্যার চেষ্টার বিষয়ে সেদিন যা বলেছিলাম, ভুলে গেছ ?

নীলকান্ত এই দেখা ঠেথার পরও হাতের জিনিসটা লুকোতে চেষ্টা করে মিনমিনিয়ে বলে, পাখির জন্যে নয়, বাঁদর মারা হবে।

বাঁদর! গুলতি দিয়ে বাঁদর মারা হবে? এটা কে শেখালো তোমায়?

মা।

মা! তোমায় বলেছেন একথা?

নীলকান্ত হঠাৎ জোরের সঙ্গে বলে ওঠে, তা বলবেন না তো কী? কষ্ট করে বড়ি দেওয়া হবে, আচার বানানো হবে, আর বাঁদর পাজীরা খেয়ে নেবে? আবদার না কি?

ওঃ! তাই জন্যে তাদের গুলতি দিয়ে মারতে হবে? বাঃ! তা ওরা জীব নয়? ওদের মারায় পাপ নেই?

নীলকান্তর গলা আরো সহজ হয়ে এলো, মরবে না হাতী! বাঁদর মারা এতো সোজা যেন।

বেটক্করে লেগে গেলে মরতেও পারে।

তা মরুক গে। ওরা তো পাজী।

চন্দ্রকান্ত ছেলের মুখের দিকে তাকান। মায়ের রূপের উত্তরাধিকারী। আবার বাড়ির মত লম্বা ছাঁদের গড়ন পেয়েছে, হঠাৎ দেখলে ওই ষোলো সতেরো বছরের ছেলেটাকে যুবক বলে ভুল হয়। কিন্তু মুখের রেখায় কোথায় সেই পরিণতির ছাপ? বালকোচিত কথা, বালকোচিত মুখ।

আস্তে বললেন, পাজী বলে মারতে হবে? আমরা মানুষরাও তো পাজী।

আহা! নীলকান্ত এটা বাবার তামাসা ভেবে বলে, আমরা কেন পাজী হতে যাব?

কেন হতে যাব? তা জানি না, তাইতো দেখা যায়। মানুষের মধ্যে পাজী দেখতে পাওনা তুমি?

নীলকান্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাপের কাছে সরে এসে আস্তে

বলে, খুব দেখছি। ঠিক বলেছ বাবা, নতুন কাকা না দারুণ পাজী। নতুন কাকিমাকে এমন মারে।

কী বললে, অ্যাঁ, মারে? শশী স্ত্রীকে মারে?

চন্দ্রকান্তর পক্ষে এই অবাক হওয়াটা হয়তো অদ্ভুত, হয়তো বা ন্যাকামি বলেই মনে হতে পারে। কারণ শশীকান্ত সম্পর্কে ওই মহৎ সংবাদটি, কেবলমাত্র যে বাড়ির সকলেরই জানা তা নয়, পাড়ার সকলেরও জানা। অথচ চন্দ্রকান্ত অবাক হলেন। তার কাছে সত্যিই খবরটি অজ্ঞাত, তাই ধারণারও অগোচর।

এই অগোচরের কারণ হচ্ছে, এ ধরনের কথা চন্দ্রকান্তর কানে তুলতে সাহস হয় না কারো। অজানা একরকম ভীতি আছে সকলের, চন্দ্রকান্ত সম্বন্ধে। এমনিতে মানুষটা শান্ত ধীর ভদ্র মমতাশীল হৃদয়বান। কিন্তু সত্যকার কোনো অন্যায় দেখলে আগুনের মত জ্বলে ওঠেন।

সংসারের মাথার উপর চন্দ্রকান্ত আছেন মাথা রক্ষার ছাতার মত। বর্ষণের ভরসা নিয়ে জলভরা মেঘের মত। আবার বুঝি সর্বদা উদ্যত বজ্রের মত।

কে জানে, এ খবর কানে গেলে শশীকান্তর উপর কী বজ্র ভেঙে পড়ে! আরো ভয় এই, বৌ ঠ্যাঙানোর খবরের সূত্রে আরো কিছু যদি জানাজানি হয়ে পড়ে। এই সব ভয়েই বাড়ির লোক তো বটেই, পাড়ার লোকরা পর্যন্ত খবরটা চন্দ্রকান্তর কাছে চেপে যায়। এমন 'ক বড়দা মেজদা পর্যন্ত, যাঁরা নাকি একান্ন ছেড়ে ভিন্ন অন্ন হয়ে অবধি খাঁটি জ্ঞাতির মতই ব্যবহার করে আসছেন।

কিন্তু বড়দা আর শশীর নামে লাগাতে আসবেন কোন মুখে? শশীর বৌ অশ্রুমতী তাঁর শালীঝি হলেও, সবটাই চেপে যেতে হয়। শশীর বিবাহকালীন পরিস্থিতিটা চন্দ্রকান্ত যদি বা ভুলে গিয়ে থাকেন, বড়দা শ্রীকান্ত নিজে ভুলতে পারেন নি। তাঁর পৃষ্ঠবল না পেলে সাত-সকালে বিয়ে হতো শশীর?

তাছাড়া অন্যদের কাছে ব্যাপারটা তো সত্যই ভয়ানক কিছু নয়! পরিবারকে ধরে ঠ্যাঙ্গানো, অথবা তুলে বাগদী পাড়ায় রাতচরা এ আর এমন কি নতুন কথা? পাড়া হাটকালে এমন কত বেরোবে! শুধু ছেলে ছোকরা কেন, বুড়ো হাবড়াদের মধ্যেও এ দোষ বিদ্যমান। শুধু চন্দ্রকান্ত এসব টের পান না।

কেউ টের পাওয়াতে আসেও যায় না।

সবাই জানে—চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত মানুষ, ছাপার অক্ষরে বই বেরোয় তাঁর। তিনি কখনো ছোট কথা কইতে জানেন না। জ্ঞাতিদের সঙ্গে ভাগ ভিন্নর সময় কী পরিমাণ উদারতা দেখিয়েছেন। চন্দ্রকান্ত ভাগের ব্যাপারে কত স্বার্থত্যাগ করছেন এবং সেই ভাগের সময় সংসারে যে কটি অখাদ্য মাল ছিল সব কটিকে নিজের ঘাড়ে নিয়েছিলেন, এসব তো কারো অবিদিত নেই। সম্পর্ক তো সকলেরই সমান। চন্দ্রকান্ত সেকথা মুখে আনেন নি। যেসব মানুষকে অন্য দশজনের মাপে মাপা যায় না, অন্য দশজনের ছাঁচে ফেলা যায় না, তার সম্পর্কে লোকের অস্বস্তি থাকে। নির্ভয় হয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

অপর দিকে আবার সেজগিন্নীর ভয়। সর্বদা গোবর জলের ঘটি নিয়ে ঘুরে বেড়ালে কি হবে, গলার জোরে তিনি হয়কে নয় এবং নয়কে হয় করে মানুষকে স্তম্ভিত করে দিতে পারেন, গালির জোরে লোককে অবশ করে দিতে পারেন। তাঁর ছেলের কথা নিয়ে কে কথা কইতে যাবে? ছেলেটিও তো কম গোঁয়ার নয়? চন্দ্রকান্তকেই যা ভয় করে। আর কাউকে কেয়ার করে?

কাজেই সকলেই মুখে তালা চাবি দিয়ে থাকেন। আজ নীলকান্তর আচমকা অসতর্কতায় চন্দ্রকান্ত চকিত, চমাকত।

শশী স্ত্রীকে মারে? তুমি জেনে বলছ? ঠিক জানো?

নীলকান্ত এরকম প্রশ্নে ভয় পেল, কিন্তু আর তো এখন পিছনো

যায় না। ডুবেছি, না ডুবতে আছি! বাপের প্রশ্নের উত্তর দিতেই হয়, জানিই তো।

আর কেউ জানে?

নীলকান্তর কথার ভঙ্গীও মায়ের মত। নীলকান্ত হাত দুটো উল্টে বলে, বিশ্বসুদ্ধ লোকই জানে।

বাড়ির লোকেরা? তোমার মা?

খুব জানেন। নীলকান্ত মাথা ঝাকিয়ে বলে, মা আবার জানে না? মা তো নতুন খুড়িকে কত বলে, 'কেন কথা শুনিস না? মার খেয়ে মরিস।' কিছু লাভ হয় না। রোজ মারে। আজও তো মেরেছে তখন।

কখন?

এই যে তখন। নতুন কাকা না—মিছিমিছি করে—চণ্ডীতলায় যাচ্ছি বলে এই ওপরের ওই পচা ঘরটার মধ্যে কপাট বন্ধ করে ঘুম মারছিল। নতুন খুড়ি অতো জানে না, ডাকতে গেছে, ব্যাস। মেরে একেবারে হাড়গুঁড়ো।

চন্দ্রকান্ত ছেলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেললেন, সত্য বলছে, না কাকার প্রতি কোন আক্রোশের বশে! তা মনে হল না, মুখে এক প্রকার নির্বোধ খাঁটিত্বের ছাপ—তার সঙ্গে বেদনারও। ওই বৌটি দৈবাৎই তাঁর চোখ পড়ে, সাবেকী বাড়ির বিচিত্র নক্সার নানান ফাঁক ফোঁকরের মধ্যে কোনখানে যে ওই মেয়েটা আপন অস্তিত্ব গোপন করে বসে থাকে!

গম্ভীর প্রশ্ন করেন চন্দ্রকান্ত, কোথায় শশী? তোমার নতুন কাকা? ডাকো তো একবার।

সে এখন আছে নাকি?

নীলকান্ত স্বভাবসিদ্ধ বালকের ভঙ্গীতে হঠাৎ হিহি করে হেসে ওঠে। নতুন কাকা এখন আছে নাকি? তোমাকে আসতে দেখেই বাগানের দরজা খুলে—হি হি—তোমায় বাঘের মতন ভয়

করে। সেজ ঠাকুমা তো বলেন, ছোড়দার ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে যাস যে, ছোড়দা—বাঘ না ভালুক? তবুও সাহস নেই। হি হি হি। একদম সটকান মেরেছে—

নীলকান্ত নিজেও সর্বদা বাবাকে এড়িয়ে চলবার তালে থাকে, তবে বাবা কথা কইলে প্রাণটা খুলে বসে। তাই আবারও হি হি করে ওঠে। হয়েছেও তেমনি মজা। মা ঘুঁটে ঠুকছিল, সেই পচা গোবরে পা হড়কে, হি হি। মজা না সাজা।

থামো। চুপ করো।

চন্দ্রকান্ত পায়চারি করতে থাকেন। আর কথা বলেন না। নীলকান্ত নামক একটা প্রাণী যে সেখানে রয়েছে, তাও বোধ হয় ভুলে যান।

নীলকান্তও এই বিস্মৃতির সুযোগ নিয়ে বাঁচে। নিজের মালপত্র গুটিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ে।

চন্দ্রকান্ত অবাক হয়ে ভাবেন, আমি তাহলে একটা অবোধ অন্ধ? বাড়িতে এমন একটা অনাচার ঘটে চলেছে—আমি জানি না। অথচ সব্বাই জানে।

তার মানে, সব্বাই আমাকে চেপে যায়। আমার অন্ধত্বের সুযোগ নেয়।

সুনয়নীও আশ্চর্য!

অথচ এমনিতে সুনয়নী কারও নিন্দে করবার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। আমার সঙ্গে যেটুকু গল্প সে করতে আসে, তার সবই তো প্রায় অপরের সমালোচনা, আর অপরের ব্যাখ্যানা।

অনেকক্ষণ বলার পর যখন টের পায় আমার কানের মধ্যে কিছুই ঢোকেনি, তখন—খুব মানুষের সঙ্গে কথা কইতে এসেছিলাম—বলে রাগ করে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

যৌবনকালের জোড়া পালঙ্কখানিই সুনয়নীর ভাগে। চন্দ্রকান্ত রাত্রে লেখাপড়ার সুবিধা হবে বলে একটা তক্তোপোষে নিজের

ব্যবস্থা কায়েম করে নিয়েছেন। আড়াল দেওয়া সেজ-এর বাতি জ্বালেন যাতে সুনয়নীর চোখে আলো না লাগে।

এক আধবার মমতা আসে না কি চন্দ্রকান্তর! মনে হয় নাকি, রাগটা ভাঙাবার চেষ্টা করা উচিত। রাগ মানেই তো দুঃখ। কিন্তু সাহস হয় না, ভালবাসা শব্দটার একটাই মানে জানেন সুনয়নী। জানেন, রাগ ভাঙাতে কাছে আসার একটাই অর্থ। তাই হয়তো কষ্ট করে বলে বসেন, বুড়ো বয়েসে যে আবার ভারী শখ দেখছি পণ্ডিতের।

রেগে নয়, বিজয়িনীর ভঙ্গীতে নিশ্চিত প্রত্যাশার সুরে।

কী করতে পারেন তখন চন্দ্রকান্ত, ছিটকে সরে আসা ছাড়া?

কিন্তু সেকথা থাক।—এই কথাটা ভেবে যন্ত্রণায় অস্থির হচ্ছেন চন্দ্রকান্ত, বাড়ির মধ্যে একটা নিরুপায় মেয়ে এইভাবে অত্যাচারিত হয়ে চলেছে, অথচ বাড়ির এতোজন মহিলা তার প্রতিকার তো দূরের কথা, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করছে না। এটা কী করে হয়? এটা কী করে হতে পারে?

বেশীক্ষণ চিন্তার সময় ছিল না। আহারের ডাক পড়ল।

চন্দ্রকান্ত থমথমে মুখে সামান্য কিছু খেয়েই প্রশ্ন করলেন, পিসিমা, শশী তার স্ত্রীকে মারে এটা সত্যি?

পিসি চমকান।

তবে সামলেও নেন, খুব অবলীলায় বলে ওঠেন, এই অখত্তে কথাটা আবার তোর কানে তুলতে গেল কে?

পিসিমা!

চন্দ্রকান্ত গম্ভীর গলায় বলেন, কে কানে তুলল, সেটা আসল কথা নয়। আসলটা হচ্ছে, বাড়িতে একটা মেয়ের উপর অত্যাচার হয়ে চলেছে অথচ তোমরা কেউ কিছু বলছ না?

পিসি ভবতারিণী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, গোঁয়ার গোবিন্দ

বেটাছেলে যদি নিজের পরিবারকে ধম্মে ঠেঙায়, কার কি হাত আছে বাবা ?

হাত নেই বলে চুপ করে বসে থাকবে ?

তা কী করবো ? নিজের মা যার পিষ্ঠবল তাকে শাসন করতে যাবার ধাষ্টামো কার হবে ?

ভবতারিণী কথা ধরলে একেবারে শেষ না করে ছাড়েন না। ছেদ ভেদ থাকে না, কমা সেমিকোলন থাকে না, কাজেই ওঁর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হয়।

পিসির থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করে চন্দ্রকান্ত বলেন, মা পৃষ্ঠবল ?

তবে না তো কী ? মা আস্কারা না দিলে এতো বাড় বাড়তো ? সেজ গিন্নিটির তো বুদ্ধি-সুদ্ধি মানুষের মতন নয়, বৌয়ের ওপর হিংসে আকোচ, তাই ছেলেকে টুইয়ে দেয় অত্যেচার করতে।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিসি বলে, সংসারে যাই আমি এক দজ্জাল আচি আর তুমি হেন ছেলে আছো, তাই সংসারের আস্ত চেহারাটি আচে। নচেৎ উনিগিন্নী একখানি ঘর তিনখানি করতেন।

এসব কথায় বিরক্ত হন চন্দ্রকান্ত। অসহিষ্ণুভাবে বলেন, ওসব কথা থাক, শশীকে যেভাবেই হোক শাসন করা দরকার। এই সব মারধোর বন্ধ করতে হবে।

ভবতারিণী একটু হেসে ওঠেন। বলেন, পারো তো বন্ধ কর। তুমি বিজ্ঞবিচক্ষণ, তোমায় আর পিসি কি জ্ঞান দেবে! তবে ঝুনো মাথার দাম আচে, তাই বলচি—স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মদ্যে মাতা গলাতে গেলে ধাষ্টামো বৈ আর কিছু হয় না। হয়তো লোকসমাজে মুক রাখতে ওই বৌই বলে বসবে, কই মারেনি তো। মারে না তো। ত্যাখন ?

চন্দ্রকান্ত একটু চুপ করে যান।

ঝুনো মাথাকে অস্বীকার করতে পারেন না।

লোকসমাজে মুখ রাখা। অমোঘ তার শাসন। 'লোকসমাজ' এইটাই বোধকরি সমাজবদ্ধ মানুষের সব থেকে বড় প্রভু।

কিন্তু এককথায়ই থেমে যাবেন?

অন্যমনস্কভাবে বলেন, তাহলে তুমি বলছো শশীকে শাসন করার দরকার নেই?

ভবতারিণী ব্যস্তভাবে বলেন, আমি কিছুই বলিনি বাবা। তুমি যদি পারো, কর শাসন। তবে ফল বিপরীত হতে পারে। তোমার শাসন খেয়ে হয়তো মুখপোড়া ছেলে আকোচের বশে—তুমি য্যাতোটি শাসন করবে, তার চতুরগুণ তাড়নটি করবে ঘরে গে। সেখেনে তো আর তুমি শাসন চালাতে যেতে পারবেনি বাবা। শশী মুখপোড়া কাজ ভাল করচে তা বলচিনে, খুবই মন্দ করচে, তবে নতুন কিছুই করেনি। পরিবার ঠ্যাঙানো কি জগৎ সংসারে নতুন ছিষ্টি চন্দোর? ঘরে ঘরেই ওই আপদ। তবে সবাই সব ঠ্যাঙানী টের পায় না। সেই যে কতায় আচে না—'মনে কাঁদলাম কেউ জানলনি, বনে কাঁদলাম কেউ শুনলনি, জনে জনে ধরে কাঁদলাম, ত্যাখন লোকে বলল, আহা দুঃখী বটে।'

বাপের সঙ্গে একটু তফাতে নীলকান্ত খেতে বসেছে, সে হঠাৎ হেসে উঠে বলে, ঠাকুমা যে কত ছড়া জানে! মার খাওয়ারও ছড়া জানে।

ছেলেটাকে কিছুতেই গুরুজন সম্পর্কে সম্যক সম্মানসূচক বাক্য শেখানো গেল না। বলে বলে পারা যায় না।

তবু এখনো চন্দ্রকান্ত বিরক্ত হয়ে তাকাল।

সেটা দেখতে পায় না এই যা।

ভবতারিণী নিজের হেঁসেলের দিকের কিছু অবদান পরিবেশন করতে করতে বলেন, তা থাকবে নি ক্যানো? মার যে একরকমের যাদু! কেউ হাতে মারে, কেউ ভাতে মারে, কেউ বচনে মারে, কেউ ব্যাভারে মারে, কেউ বুঝে মারে কেউ না বুঝে মারে,—মার খেতে

খেতেই জীবন অতিবাহিত করা। ও তোমার মেয়েপুরুষ ভেদ নেই, গরীব বড়মানুষে রক্ত ভেদ নেই। পেত্যক্ষে অপেত্যক্ষে কে যে কত পড়ে পড়ে মার খেয়ে চলেচে, তার হিসেব আছে ?

স্বভাবগত পদ্ধতিতে এক দমে তত্ত্ব কথার বান বইয়ে তবে ক্ষ্যামা দেন ভবতারিণী।

কিন্তু চন্দ্রকান্তও কেন হঠাৎ এমন থেমে যান ? স্তব্ধ হয়ে যান ? হাতের ভাতটা মাখতে মাখতে যে হাত থেমে গেছে তা যেন মনেই থাকে না। শুধু আরো একবার ঝুনো মাথাকে স্বীকার করেন।

ভবতারিণীর অক্ষর পরিচয় নেই, শ্বশুরবাড়ির কী একটু ধানপান বিষয়-সম্পত্তি আছে, তার পাওনা-কড়ি নিয়ে সই দিতে 'টিপসই' দেন। কিন্তু ভবতারিণীর জীবনদর্শন, ভবতারিণীর জীবনবোধ, মানব চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান কী পরিষ্কার ! প্রকাশভঙ্গী কী জোরালো !

'পড়ে পড়ে মার খাওয়া' কথাটা সন্দেহ নেই শব্দ ভাণ্ডারের একটি সম্পদ। একটি ছত্রে একটি দুঃসহ জীবনের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, প্রত্যক্ষে ধরা দেয়।

পড়ে মার খাওয়ার নজির চন্দ্রকান্তর জানা জগতেই কি নেই ?

পাঁচ

বহুকাল পরে আজ আহারান্তে পানের খিলি হাতে নিয়ে দোতলায় উঠে এলেন সুনয়নী। দুপুরের অবকাশটা তো তার কাটে কেবল অপ্রয়োজনীয় কাজকে প্রয়োজনীয় করে তোলবার সাধনায়। অবশ্য নীচের তলায় স্বগতোক্তিটা শুনিয়ে এসেছেন, যাই দেখি, বিছানা বালিশগুলো কদিন রোদে পড়েনি—

চন্দ্রকান্ত বেশ খানিকক্ষণ অস্থির চিন্তায় সময় কাটিয়ে জোর করে মনঃস্থির করে নিজের খাতাপত্র নিয়ে বসেছিলেন তক্তপোষের উপর, জানলামুখো হয়ে। এই জানলাটা দিয়ে বিকেলের আলো আসে, অনেকক্ষণ থাকে আলোটা। সবে দোয়াতে কলম ডুবিয়েছেন, সুনয়নী এসে জানলার কোণের চওড়া বেদীটার উপরই চেপে বসলেন। আলোটা কিঞ্চিত ব্যাহত হলো।

চন্দ্রকান্ত কিছু বললেন না, শুধু কলমটা হাত থেকে নামিয়ে রাখলেন। বোঝা যাচ্ছে, সুনয়নীর কিছু বক্তব্য আছে।

হাতের বাড়তি পানের খিলিটা হাতে ধরে সুনয়নী বলেন, জন্মজীবনে আর তোমায় পান খাওয়াটা ধরাতে পারলাম না। একলা খেয়ে সুখ আছে?

চন্দ্রকান্ত একটু হাসলেন।

ব্যঙ্গের, না ক্ষোভের, না কৌতুকের?

বললেন, সুখ নেই, সেটা বুঝতে এতোদিন লাগল?

চিরদিনই বুঝেছি, কতদিন তো খোসামোদও করেছি, ভুলে গেছ তাই বল। বুড়োমিনসের যে পান খেলে জিভ তেতো হয়ে যায়, এ কথনো শুনিনি।

চন্দ্রকান্ত এ কথার আর উত্তর দেন না। দেবার আছেই বা কী? প্রশ্ন তো নয়।

মরুক গে, নিজেই চিবোই।—বলে পানটা মুখে ফেলে আঁচলের খুঁট থেকে এক টিপ দোক্তা বার করে মুখে দিয়ে সোজা জানলার গরাদের ফাঁকে ছপাৎ করে খানিকটা পিক ফেলেন।

বিচলিত চন্দ্রকান্ত বলে না উঠে পারেন না, ওটা কী হল?

কী আবার হবে?

কোথায় পড়ছে না দেখে—

সুনয়নী ময়লা শাড়ীর কোণ দিয়ে ঠোঁটের ভিজে ভিজে কোণটা মুছে নিয়ে অবহেলার গলায় বলেন, কোথায় আবার পড়তে যাবে, গাছপালার ওপর পড়েছে। জানলার ধার পর্যন্ত তো গাছ।

তলা দিয়ে কেউ যেতেও পারে।

তোমার যত ছিষ্টিছাড়া চিন্তা। এখন আবার কে বাগানের ধারে আসতে যাবে?

আবার একবার ঠোঁটের কোণটা মুছে নিলেন।

সুনয়নী এমন ময়লা কাপড় পরে কেন? সুনয়নীর কাপড় পরার ভঙ্গী এমন আলুথালু অগোছালো কেন? যখন তখন মাথায় এতোখানি ঘোমটা টানে, অথচ কাঁধ পিঠ প্রায় উন্মুক্ত।

কিন্তু সুনয়নী এমন গুছিয়ে এসে বসল কেন? শুধুই কি সারাজীবনের চেষ্টায় স্বামীকে পান খাওয়ার অভ্যাস ধরাতে না পারার দুঃখ জানাতে?

প্রশ্নটা অস্বস্তিতে ফেলল চন্দ্রকান্তকে।

অথচ এই একটুমাত্র আগে নানা অস্বস্তি জোর করে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে খাতাপত্র নিয়ে বসেছিলেন।···ভেবে দেখেছেন—এই বস্তুটার মধ্যেই শান্তি, এর মধ্যে আশ্রয়।

কিন্তু সুনয়নী সামনে বসে রয়েছেন একটি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত।

চন্দ্রকান্ত অতএব ওই চিহ্নের দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকান।

সুনয়নী আরো একটু এদিকওদিক কথা বলে অবশেষে সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দেন। ছোট খুড়ির মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে নাকি একটি পরমা-সুন্দরী কন্যা আছে, শুনে পর্যন্ত সুনয়নীর মনপ্রাণ উত্তাল হয়ে উঠেছে। ভাল জিনিস তো বাজারে পড়ে থাকতে পায় না, তাড়াতাড়ি ঘরে তুলতে না পারলে নির্ঘাৎ হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই চন্দ্রকান্তকে বলতে আসা। পিসিমা আর ছোটখুড়ি মারফৎ তাহলে অবিলম্বে কথাটা পাড়ানো হোক। আশ্বাস পেলে কন্যেপক্ষ দস্তুরমাফিক প্রস্তাব করতে আসবে।

ধৈর্য ধরে কথাটা শুনলেও, প্রায় হাঁ-করেই তাকিয়ে দেখছিলেন চন্দ্রকান্ত সুনয়নীর আহ্লাদে উদ্বেল পানঠাশা শীর্ণ হয়ে যাওয়া মুখটা। পান চিবোনোর জন্যে মুখের পেশীগুলো ওঠানামা করায় রোগাত্বটা আরো ধরা পড়ছে।......

কথা শেষ হবার পর চন্দ্রকান্ত অবাক প্রশ্ন করলেন, কিন্তু কারজন্যে?

কী কার জন্যে?

পাত্রী?

সুনয়নী তাঁর পেটেণ্ট কথাটি ছাড়েন, ন্যাকা। কার জন্যে হামলে মরছি আমি? ননীগয়লানীর ছেলের জন্যে?

ওঃ। তাহলে তোমার ছেলের জন্যে?

এতোক্ষণে বুঝলে? পণ্ডিতের মাথা তো, ছোট কথা সহজে ঢুকতে চায় না।

ঠিকই বলেছ, চন্দ্রকান্ত আবার কলমটা কালিতে ডুবিয়ে বলেন, কথাটা আমার মাথায় সহজে ঢোকবার নয়। তুমি যে এখন নীলকান্তর বিয়ের কথা ভাবতে বসছ, এটা বোঝা শক্ত বৈ কি।

সুনয়নী মুখ ঘুরিয়ে বলেন, আহা! বলতে মাত্তরই হয়ে যাচ্ছে বিয়ে? বলতে কইতেই দিন যাবে। তবে মেয়ে নেহাৎ ছোট নয়, বারোর কাছে বয়েস, ওরা কি আর বেশীদিন রাখবে? পাকা দেখাটা করে রাখলে বেঁধে রাখা হল।

তোমার মনে হয় নীলকান্তর বিয়ের উপযুক্ত বয়েস হয়েছে?

সুনয়নী একটু অপরূপ হাসি হেসে গলা নামিয়ে বলেন, নিজের কোন বয়েসে বিয়ে হয়েছিল মশাই?··· তখনই তো বলা হয়েছিল, 'আলো বাড়াই, তোমায় একটু দেখি।'

চন্দ্রকান্ত তাকিয়ে দেখলেন।

চন্দ্রকান্তর কি উচিত ছিল না এই কৌতুকে কৌতুক-হাসি যোগ করা? এই স্মৃতি রোমন্থনের অংশীদার হওয়া? কিন্তু কই তা হলেন? বরং মুখটা অধিক গম্ভীর হয়ে গেল চন্দ্রকান্তের, কাগজে কলমের রেখা টানতে টানতে বললেন, তোমার স্মৃতিশক্তিটা দেখছি খুব প্রখর।

সুনয়নী ভুরু কুঁচকে তাকালেন, কি শক্তি?

স্মৃতিশক্তি। পুরানো কথা তো খুব মনে থাকে।

সুনয়নী অবশ্যই এই গাম্ভীর্য আশা করেন নি, বেজার গলায় বললেন, তোমার মতন নতুন নতুন কথা তো মনে ঢুকছে না, পুরনো নিয়েই আছি।

হুঁ।···চন্দ্রকান্ত ক্ষুব্ধ হাসি হাসেন, বই টই তো পড়তেও জানতে একসময়। বঙ্কিমবাবুর কী একটা পড়েছিলে মনে হচ্ছে। সে সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছ কেন?

আহা। সে কোন ছোটবেলার কথা। এখন তোমার সংসারে পটের বিবি সেজে নাটক নভেল মুখে দিয়ে বসে থাকলেই চলবে আমার!

তা বটে!

চন্দ্রকান্ত একটু রূঢ় হাসি হাসেন, আমার সংসারের ঘুঁটে দেওয়ার দায়টা পর্যন্ত যখন তোমার, তখন আর ওই সব বইটই পড়ার মত বাজে কাজ করবার সময় কোথা! যাক। তোমার কথা হয়েছে?

সুনয়নী কণ্ঠস্বরে জ্বলে ওঠেন,

চন্দ্রকান্ত ওঁকে নির্বোধ ভাবলেও, তেমন নির্বোধ তো আর নয় সত্যি। এ অপমান বোঝবার ক্ষমতা আছে।

জ্বলে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, ঝকমারি হয়েছে আমার আহ্লাদ করে তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে আসা। বেশ···নীলের বিয়ের ব্যবস্থা আমিই করব। কোন জন্মে সেই ছুটো মেয়েকে গোত্তর পাল্টে বাড়ি ছাড়া করে দেওয়া হয়েছে। আর কোন কাজ হয়েছে বাড়িতে? তুমি না হয় নিজের মহিমায় ডুবে বসে আছো, সাধ আহ্লাদ নেই, আমি তুচ্ছ মেয়েমানুষ, আমার সে সব আছে।

চন্দ্রকান্তর মুখে এসে যাচ্ছিল, শশীকান্তের বিয়ের আগে সেজখুড়ি ঠিক এই ভাষাই প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সামলে গেলেন। বিধবা সেজোখুড়ির সঙ্গে তুলনা করলে হয়তো বা দেওয়ালে মাথা খুঁড়তে বসবেন সুনয়নী।

সুনয়নী চলে যাচ্ছিলেন ঘর থেকে, রাতদিনের ঝি টেঁপির মা দরজার বাইরে থেকে বলে উঠল, ছোট বৌদিদি, পিসিমা বলে পাঠালো ও পাড়া থেকে গৌরবাবুর পরিবার দেকা করতে এয়েছে —

চমৎকার।

সুনয়নী আবার বসে পড়ে বলেন, আমি পারব না সেই মেম সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে।

চন্দ্রকান্ত চঞ্চল হয়ে উঠে পড়েন।

বিব্রতভাবে বলেন, গৌর—আমাদের গৌরমোহনের স্ত্রী। তিনি আবার মেমসায়েব হলেন কবে?

যতকাল কলকাতাবাসিনী হয়েছেন। সুনয়নী তেতো গলায় বলেন, আমি বাবা গেঁয়ো ভূত, ওসব সেমিজ-বডিস পরা কলকত্তাই মেয়েছেলের সঙ্গে কী কথা কইব? নেমে গিয়ে বল গে—ছোট বৌ পেট ব্যথায় ছটফট করছে। শুয়ে আছে।

বাঃ।

চন্দ্রকান্ত গাঢ় গম্ভীর গলায় বলেন, ইচ্ছে করে নিজেকে ছোট

কোর না ছোটবো। পিসি খুড়িমারা সবাই গেঁয়ো, দ্যাখো গিয়ে তাঁরা কী রকম গল্প জুড়ে দিয়েছেন।

ওঁদের কথা বাদ দাও।

সুনয়নী জানলার রেলিং চেপে শক্ত হয়ে বসে থাকেন।

চন্দ্রকান্ত হতাশ হয়ে বলেন, আমি গিয়ে মিছে কথা বলতে পারব না।

ওঃ! তাওতো বটে। মহাপুরুষ মানুষ! বেশ সত্যি কথাটাই বলগে গিয়ে, আমার মুখে চুনকালি মাখাতে।

চন্দ্রকান্ত অস্থির হন।

গৌরের স্ত্রী কী ভাবছে সুনয়নীর নামতে দেরী দেখে! কী ভাববে সুনয়নীর না আসায়! সরে এসে প্রায় অনুনয়ের গলায় বলেন, কী ছেলেমানুষী হচ্ছে? তুমি দেখা না করলে কী মনে করবে?

তা কী করা যাবে?

সুনয়নী শক্ত মুখে বলেন, আমায় অসভ্য ছোটলোক ভাববে, আর কী হবে?···মেম সাহেবের ঢং তো জানি, হাত ধরে কথা বলবেই বলবে। এই পড়ন্ত বেলায় আবার ডুব দিয়ে মরতে হবে আমায়।

চন্দ্রকান্ত ব'সে পড়েন।

গৌরের স্ত্রী তোমার হাত ধরলে ডুব দিতে হবে?

না দিলে পিসিমাদের দিকে কিছু করতে পারব?

চন্দ্রকান্ত রাগটা চেপে ধরে বলেন, পিসিমা বলেছেন একথা?

সুনয়নী মুখ ফিরিয়ে বলেন, মুখে কি আর বলতে এসেছেন? ভাবে বুঝতে হয়।···ছোঁয়া গেলে নিজে তো ডুব দেন।

চন্দ্রকান্ত ভুলে যান নিচের তলায় কেউ দর্শনার্থী। কেমন একটা স্খলিত বিষণ্ণ স্বরে বলেন, এর অর্থ কী বলতে পারো? গৌরমোহন কি পতিত?

তা বেম্মঃআর পতিতে তকাৎ কি?

বেহ্ম! গৌরমোহন ব্রাহ্ম? এমন অদ্ভুত কথা কে বলেছে তোমায়?

না বললে আর বোঝা যায় না?

সুনয়নী মুখটা বিকৃত করে বলেন, কলকাতায় বাস করলে জাত ধম্ম কিছু থাকে নাকি? হেঁশেলে রাঁধুনী বামুন, ঠিকে ঝিয়ের হাতে জল বাটনা! এখানে এসেও গায়ে জামা সেমিজ! ভগবান জানে সেখানে জুতো মোজাও পরে কিনা—বেম্ম খেষ্টান আর কাকে বলে!

চন্দ্রকান্ত অস্থির পদক্ষেপে ঘরে ঘুরে বেড়ান। সুনয়নীর দিকে তাকিয়ে দেখতেও ইচ্ছে হয় না আর। এই সময় আবার টেঁপির মা সিঁড়ি থেকে ডাক দেয়, কইগো ছোটবৌদি, নামলে নি? পিসিমা ব্যস্ত হতেচে।

অতএব সুনয়নীকে উঠতেই হয়।

পরিণামটাও তো চিন্তা করতে হবে।

সহজ মানুষ এই মাত্র হয়তো দোতলায় উঠল অকস্মাৎ। এমন পেটব্যথা করল যে নীচে নামতে পারছে না এরকম ঘটনার সংবাদে আবার সদলবলে সবাই ছুটে দেখতে না আসে!—হয়তো পিসিমাদের সঙ্গে তিনিও এসে হাজির হবেন। ঘরের দৃষ্টি ছুঁয়ে লেপে এক করবেন। দরকার নেই বসে থেকে।

সুনয়নীকে অগ্রসর হতে দেখে চন্দ্রকান্ত আস্তে বলেন, একখানা ফর্সা কাপড় পরে গেলে হত না?

সুনয়নীর চোখে আবার ফস করে আগুন জ্বলে ওঠে, কেন? নইলে তোমার বন্ধুর পরিবার তোমার পরিবারকে বাড়ির ঝি ভাববে? ভাবুক। আমার অমন লোক দেখানো ঠাট্ আসে না। গেরস্ত ঘরের বৌ-ঝির কাপড়ে তেল হলুদের দাগ থাকে না? সর্বদা ধোপ-দুরস্ত হয়ে বসে থাকে?

তরতরিয়ে নেমে যান।

চন্দ্রকান্ত শুনতে পান, সিঁড়িতে টেঁপির মার উদ্দেশ্যে একটি কলকণ্ঠ ঝঙ্কৃত হচ্ছে—আর বলিসনে ভাই, একেবারে মরণের ঘুম ঘুমিয়ে মরেছিলাম! তোর ছোড়দাবাবু ডেকে দিল তাই—

চন্দ্রকান্ত কি কালি শুকিয়ে যাওয়া কলমটা ফের দোয়াতে ডুবিয়ে তাঁর ভাবী উপন্যাসের ছক আঁকতে চেষ্টা করতে বসবেন?

বেলা পড়ে গেছে।

যে জানলাটা দিয়ে শেষবেলা পর্যন্ত আলো আসে, একটু আগে যার নীচে থেকে উঠে গেছেন, সেই জানলাটার বাইরে চোখ মেলে বসে থাকেন চন্দ্রকান্ত।

এখানে আকাশে অপরূপ বর্ণচ্ছটা। শুধু এই বিচিত্র বর্ণাভার পিছনে আলোর আশ্বাস নেই। অন্ধকারের ইসারা।

ক্রমশঃই ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হয়ে আসছে। ও-পিঠের আবছা আলো যেন সমস্ত দিগন্তটাকে একটা বিষণ্ণতায় মুড়ে ফেলে নিরুপায় চোখে বিদায় নিচ্ছে।… হঠাৎ চোখে পড়ল, জানলায় লাগানো তারের জালতির গায়ে দড়ির টুকরোর মত খানিকটা লম্বা হয়ে ঝুলছে সুনয়নীর ফেলা পানের পিক।

ছয়

ভাতে বসতে তো কিছু দেরী রয়েছে, একটু চা চলবে চন্দর ?

বন্ধুর প্রশ্নে চকিত হন চন্দ্রকান্ত. চা ?

কী হে, জিনিসটার নামই ভুলে গেছ নাকি ?

গৌরমোহনের কণ্ঠ কুণ্ঠিত, চোখ হাস্যোজ্জ্বল। আমার তো ভাই কলকাতায় থাকতে থাকতে ওই বদভ্যাসটি পাকা হয়ে গেছে। শুধু আমারই বা বলি কেন, গিন্নীটিও ওই পাপে পাপী। ছেলে-মেয়েগুলোকে অভ্যাস করাতে বারণ করি, তাও মাতৃস্নেহের বশে একটু আধটু পেসাদ চলে। যাই হোক, সরঞ্জাম সব আনা হয়েছে, খাবে তো বল, গিন্নীকে অর্ডার দিয়ে আসি।

চন্দ্রকান্ত একটু হেসে বলেন, না ভাই। অভ্যাস নেই, হয়তো রাতে ঘুম হবে না।

না হলে জেগেজেগে কবিতা রচনা করবে। গৌরমোহন হাসেন, তোমার খাতিরে আমারও একটু প্রাপ্তি ঘটতো।...যাক। তোমার মনে আছে চন্দর, আমাদের সেই প্রথম চা খাওয়ার ইতিহাস ? দ্বিজেন আমাদের ধরে নিয়ে গেল, মেছোবাজারে না মুক্তারামবাবুর গলিতে, ঠিক মনে পড়ছে না—ওর এক মাসতুতো দাদার বাড়ি।... বলল তোদের আজ আমার বৌদির হাতের চা খাওয়াবো। আমাদের সে কী ভয়, যেন নিষিদ্ধ কোন নেশার পাত্র হাতে নিয়ে বসেছি। বুকটুক বেশ ধড়ফড় করেছিল। তুমি ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলেছিলে, মানুষ যে কী করে প্রথম মদ খায় ? চায়েই তো হৃৎকম্প হচ্ছিল। অথচ কলেজের ছাত্ররা তখন 'দোহাত্তা মদ' খেতো।

চন্দ্রকান্ত বলেন, তুমি বললে বলেই মনে পড়ল।

তারপর তো বেশ চালানো গেল কিছুদিন, একটা চায়ের দোকানও আবিষ্কার হল।···গৌরমোহন হেসে ফেলে বলেন, আমি তো ভাই তদবধিই চা-খোর। তুমি দেশে এসে পুরনো ধাঁচেই রয়ে গেলে। অবিশ্যি ভালই করেছ, নির্জনে বসে বসে জ্ঞান-চর্চা করে চলেছ।

চন্দ্রকান্ত অন্যমনস্কভাবে বলেন, জ্ঞানচর্চা করছি কি অজ্ঞানচর্চা করছি জানি না ভাই। তবে মাঝে মাঝে মনে হয়, যদি তোমার মত কলকাতায় গিয়ে বসবাস করবার সুযোগ পেতাম, হয়তো জীবনের চেহারা অন্যরকম হতো।

সে তো হতোই—

গৌরমোহন বলেন, আমার তো হল পাকেচক্রে—মা গেলেন, জেঠিমা গেলেন, বৌকে একা রেখে যাই কী করে! অথচ এতো দূর থেকে রোজ অফিস যাওয়া-আসাও পোষাল না—মাঝেমাঝে এখানে আকাশ বাতাসের জন্য মন কেমন করে, প্রাণ হাঁপায়, তবে ওখানের সুখ-সুবিধে আরাম আয়েস ভেবে আর।—আমি বলি, রিটায়ার করার পর দেশের বাড়িতে এসে থাকব। বৌ বলে অসম্ভব।

চন্দ্রকান্ত বলেন, না আসাই বোধ হয় ভাল গৌরমোহন। এখানে আকাশ-বাতাস খোলা, কিন্তু মানুষগুলো বদ্ধ জলার মত। জীবনের কোন পরিবর্তন নেই। কূপমণ্ডুকের মত যে যেমন ছিল, সে সেখানেই বসে আছে। পঞ্চাশ বছরেও একতিল নড়চড় নেই। কলকাতার জীবনে প্রবাহ আছে, তরঙ্গ আছে, স্রোত আছে, ভাঙন আছে।

চন্দ্রকান্তর এই গভীর আর বিষণ্ণ কণ্ঠের প্রভাবে আবহাওয়াটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

যদিও বাতাস আসছে এলোমেলো, দুপুরের গরম হলেও

বৈশাখের বাতাসে মাদকতা আছে। জানলা দিয়ে একটা তেঁতুল গাছ চোখে পড়ছে, তার পাতাদের অবিরাম ঝিলিমিলি যেন হঠাৎ সমুদ্রের অবিরাম ঢেউয়ের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

বিশ্বপ্রকৃতির এই অকৃপণ সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে বাস করেও মনুষ্য-প্রকৃতিতে সৌন্দর্যের এমন ঘাটতি কেন এখানে!

চন্দর, তোমার লেখাগুলি আনলে না?

পাগল।

কেন ভাই, আমি তো দেখি খুবই তারিফের যোগ্য। বিশেষ করে দেশাত্মবোধকগুলি—

নাঃ ভাই, ওসব ছেলেমানুষী লাগে এখন। ভাবছি—

কী ভাবছেন, বন্ধুর কাছে আস্তে আস্তে ব্যক্ত করেন চন্দ্রকান্ত। সমাজের চেহারা কেমন হলে ভাল হয়, তাই নিয়ে কল্পনা। সেই কল্পনার গাছে ফসল ফলাবার সাধ।

গৌরমোহন উৎসাহ দেন। বলেন, জিনিসটা একটা কিছু নতুন হবে! অতীতকে নিয়েই সবাই লেখে, কেউবা বর্তমানকে নিয়ে, কিন্তু ভবিষ্যৎকালকে নিয়ে! না, তোমার চিন্তাটা বেশ মৌলিক। মনে হচ্ছে—একদা এক গুপ্ত-কবি মেয়েদের লেখাপড়া শেখা নিয়ে যে ভবিষ্যৎ ছবি এঁকে টিটকিরি দিয়েছিলেন, আর এক গুপ্ত-কবি তার উচিত জবাব দিয়ে যাবে। কিন্তু ভাই—একবার কলকাতা গিয়ে কিছুদিন থাকা দরকার তোমার। সমাজ যে এখন বর্তমানে ঠিক কোথায় পৌঁছেছে, সে তুমি এখানে বসে বুঝতে পারবে না। তুলনা করলে— বহু বিষয়ে বাংলার এই গ্রামগুলো কলকাতার থেকে একশো বছর পিছিয়ে আছে। তবে? ছুটো মিলিয়ে না দেখলে?

চন্দ্রকান্ত আস্তে বললেন, ভাবছি তাই যাব। তুমি আমার জন্যে একটা ছোট্ট বাসা দেখো।

কেন, আমার বাসায় থাকা চলবে না?

চন্দ্রকান্ত হাসেন, চলবে না! কেন? তবে একা না থাকলে চোখ কান ঠিক সজাগ থাকে না।

গৌরমোহন ওই 'একা' শব্দটা ঠিক অনুধাবন করতে পারেন না, একা মানে কি যৌথ পরিবার থেকে সরে গিয়ে একা সংসার পাতা! বলেন, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?

সর্বনাশ। নতুন করে আবার শব্দ তত্ত্ব পড়ো গৌরমোহন! 'একা' মানে কি সঙ্গে স্ত্রী?

বাঃ, তাহলে তোমার রান্নাটান্নার কী হবে? বন্ধুর বাড়ীতে যখন থাকছো না—

সেটা কোন চিন্তার বিষয়ই নয়। স্বপাকে সেরে নেওয়া যাবে।

গৌরমোহন মাথা নাড়েন, ওকথা বামুনের ছেলের মুখে সাজে চন্দর। বদ্যির ছেলের মুখে নয়।

তার মানে?

মানে এই, বদ্যির ছেলেদের অন্য অনেক ক্ষমতা থাকলেও রেঁধে খাবার ক্ষমতা নেই—এ আমার নিশ্চিত ধারণা। বদ্যির ছেলেরা এক গেলাস জল ঢেলে খেতেও পটুত্ব দেখাতে পারবে না।

অদ্ভুত কথা বলছ—

আরে বাবা, দেখে শুনে জেনেই বলছি। দেখলাম তো ঢের।

আচ্ছা দেখা যাক। বলেন চন্দ্রকান্ত। বলেন বটে—কিন্তু গৌরমোহনের নিশ্চিত ধারণার বিরুদ্ধে জোরালো তর্ক করতেও পেরে ওঠেন না। খুব বেশী তো আস্থা খুঁজে পাচ্ছেন না নিজের মধ্যে। তবু ওই তুচ্ছ সমস্যাটাকে প্রাধান্যও দিলেন না। বললেন, সে দেখা যাবে।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো চন্দর—

কী?

মনে হচ্ছে, তুমি যদি সে সময় মনস্থির করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতো তোমার মনের উপযুক্ত ক্ষেত্র পেতে। চিন্তার বিস্তারের জায়গা

পেতে। কু-সংস্কার মুক্ত একটা ধর্মেরই দরকার ছিল তোমার।

উঁহু—

চন্দ্রকান্ত বাধা দিলেন। ওটা ঠিক বললে না—ওঁরা যে 'কুসংস্কার মুক্ত' আমি অন্ততঃ বলতে পারব না। মন আমি স্থির করে ফেলেছিলাম গৌরমোহন, যখন উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু ফিরে এলাম কেন জানো? ওই কুসংস্কারে ঠেক খেয়েই।

কুসংস্কার! বল কী! কী দেখেছিলে বলতো?

দেখো গৌরমোহন, বলতে গেলে অনেক কথা। এতো দিন পরে আর কী বলব! তবে হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু সমাজের প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা রীতিমত কুসংস্কারের মতই ওঁদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে, এ আমি প্রতিপদে লক্ষ্য করেছি ভাই। তার সঙ্গে শুচিবাই—

নাঃ। তুমি তো আমায় তাজ্জব করে দিচ্ছ চন্দর। আবার শুচিবাইও?

দেখো গৌরমোহন, শুধু দশবার পুকুরে ডুব দেওয়া অথবা, ছোঁওয়া-ছুঁৎই শুচিবাইয়ের একমাত্র লক্ষণ নয়। যে কোন ব্যাপারে অতিরিক্ত গোঁড়ামিকেই আমি শুচিবাই বলব!···আমি তখন ওই নবধর্মে আকৃষ্ট হয়ে যাঁর কাছে যাওয়া আসা করতাম, সেই যতীন-বাবুর মধ্যে প্রকৃত ব্রহ্মের আদর্শ সম্বন্ধে যা গোঁড়ামি দেখতাম, তা আমার কাছে 'শুচিবাই' বলেই মনে হতো।···অবশেষে একদিন শুনতে পেলাম, কোন একটি ছোট ছেলেকে তিরস্কার করা হচ্ছে—তুই যে দেখছি হিন্দুবাড়ির ছেলেদের মত অসভ্য অবাধ্য হয়ে উঠছিস, সেদিনই নিজেকে নিবৃত্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম!···

গৌরমোহন বললেন, কী আশ্চর্য! এটা আর এমন কি কথা?

চন্দ্রকান্ত হাসলেন, হয়তো এমন কিছুই নয়, আবার অনেকও।

কই সেদিন তো একথা বলনি। শুধু বলেছিলে মনঃস্থির করতে পারছো না—

কথা তো তাই-ই গৌর!···তবে হ্যাঁ, ওদের কিছু আচার্যের মধ্যে

যে উদার চিন্তা,যে গভীর ঈশ্বর উপলব্ধির এবং যে প্রশান্তি দেখেছি, তা আমায় যথেষ্ট মুগ্ধ করেছিল।...তাছাড়া মেয়েদের উন্নতি সম্পর্কে চিন্তা, তাদের শিক্ষার বিস্তারের চেষ্টা, আর মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা-বোধ, অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। তবে ওই যা বললাম—মনে হল, এ সর্বসাধারণের জন্যে নয়।

গৌরমোহন আস্তে বলেন, আমাদেরও তো ওই ধরনেরই চিন্তা-ভাবনা ছিল। তুমি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলে। তাই বলছিলাম—

হয়েছিলাম গৌরমোহন. অস্বীকার করবো না। কিন্তু কাছে এসে সেখানে সেই গভীরতার স্পর্শ পেলাম না। আমার মনে হয়, যে ধর্মমত অপর ধর্মমতকে নীচু চোখে দেখে, তার মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের উপাদানের অভাব।...আসলে—কোন ধর্মমত বা রাজনৈতিক মতবাদের উপর ভিৎ গেড়ে পূর্ণ মনুষ্যত্ব সম্ভব নয়। তোমার কী মনে হয়?

গৌরমোহন আস্তে আস্তে বলেন, আমরা ভাই আদার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজ রাখি না। বামুনের ছেলে, একদা গলায় একগাছা পৈতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটাকেই আঁকড়ে আছি। আর সেটা ধরে দু বেলা গায়ত্রীটা করি—এই পর্যন্ত।...তাছাড়া অফিস যাই, বাজার করি, ছেলেদের পড়াই, ঠেঙাই, গিন্নীর সঙ্গে কখনো রসালাপ কখনো কষালাপ চালাই। বলতে বাধা নেই—মাছ মাংস ডিম পিঁয়াজ সবই খাই, আর চেষ্টা করি কখনো যেন কোনো অকাজ কুকাজে মন না যায়। ব্যাস।

চন্দ্রকান্ত বন্ধুর হাতের উপর একটা হাত রেখে একটু আবেগ-ভরে তাতে চাপ দিয়ে গাঢ়স্বরে বলেন, তুমিই প্রকৃত সুখী গৌরমোহন।

সাত

চন্দ্রকান্ত যখন ও-বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বন্ধুর সঙ্গে বিশ্রামালাপে রত, তখন এ-বাড়িতে মহিলা মহলে এক উত্তপ্ত উত্তেজনার চাষ চলছে।···বাড়ির সকলে তো বটেই, উঠোনের মধ্যবর্তী পাঁচিলতোলা তালাবন্ধ দরজা খুলে ফেলে জ্যাঠতুতোরা সবাই এসে জড়ো হয়েছেন এবং সবাই সবাইকে জেরা করছেন।

অথর্ব বড় জ্যেঠি প্রাচীরের ওধার থেকে ভাঙা গলায় চেঁচাচ্ছেন, কী হয়েছে আমায় একবার বলে যাবি তো তোরা? হারামজাদিরা, অ নক্কীছাড়া মেয়েমানুষরা, হৈচৈ করে বেরিয়ে গেলি, ভাবচিস না যে একবার বুড়িটা আটকাটিয়ে মরবে।

কিন্তু সেদিকে কারো কান নেই।

এখানে জেরাকর্ত্রীর প্রধান হচ্ছেন গুপ্তদের বড়বৌ। অশ্রুমতী যাঁর বোনঝি। টেঁপির মার চীৎকার তাঁর কানেই আগে পৌঁছেছিল।

জলে ডুবে গিয়েও ডুব জল থেকে উঠে আসা অশ্রুমতী দাওয়ার ধারে শুধু একখানা মাহুরে শুয়ে আছে, কারণ তাকে শুকনো একখানা কাপড় পরানো হলেও গা মাথা মোছানো যায় নি, ভিজে চুলের রাশি থেকে জল ঝরছে, কাজেই বালিশ বিছানায় শোওয়াবার প্রশ্ন ওঠেনি। অশ্রুমতীর চোখ দিয়ে যে পরিমাণ অশ্রুধারা নির্গত হচ্ছে, জমিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে তাতেও ডুবে মরতে পারতো অশ্রুমতী। জমিয়ে রাখা হচ্ছে না এই যা।

কিন্তু অশ্রুমতী তো কিছুতেই স্বাকার করছে না, সে ডুবে মরতে গেয়েছিল। কেন তা যাবে? তার এতো সুখের শ্বশুরবাড়ি,

এতো সুখের জীবন, মরতে যাবে কী দুঃখে? ·হঠাৎ পা পিছলে গিয়ে—

এদিকে টেঁপির মা বিপরীত সাক্ষ্যে মুখর।

হঠাৎ পা পিচলে? বললেই হল? শ্যাওলা নাই, দাম নাই, খটখটি ঘাট, আমি বুড়ি পাঁজা পাঁজা বাসন নে যেতেচি, আসর্তেছি, পা পিচলোচ্ছে না, আর তুমি তেজপাতা হেন মেয়ে অমনি হঠাৎ পা পেচলালো?·· বলি হঠাৎ পা পেচলাতে মানুষ ভরদুকুরে হাতের উলি, গলার হার খুলে থুয়ে চোরের মতন চুপিসাড়ে ইদিক উদিক চাইতে চাইতে ঘাটে আসে? হাতে শুধু শাঁখা, গলা খালি। অতএব মেয়েমানুষ, তুমি সোয়ামী শাউড়ির হাতে দড়ি দেওয়াতে এই মতলব ভেঁজেছিলে?

অশ্রুমতী অশ্রুর সাগরে ভাসে। খুলে রেখে যাবে কেন? হার বালা খুলে সাজিমাটি দিয়ে পরিষ্কার করছিল, সেই জন্যেই অসময়ে ঘাটে আসা। তা হাত ফসকে গয়না দুটো গেল জলে পড়ে, তাতেই না তাড়াতাড়ি জলের মধ্যে নেমে যাচ্ছিল, আর সেটা তুলতে গিয়েই—

কিন্তু এতগুলো জেরার মুখের সামনে অশ্রুমতী নামের মেয়েটা কি বটবৃক্ষের মত স্থির থাকবে? শুকনো খড়ের মত উড়ে যাবে না?

হাত ফসকে পড়ে গেল?

গেল তো গেল কোথায়? পুকুর তো তোলপাড় করল টেঁপির বাপ আর তার ভাগ্নে!···যারা টেঁপির মার পরিত্রাহি চীৎকারে মাঠ থেকে ছুটে এসে অশ্রুমতীকে জল থেকে টেনে তুলে ছিল।

ভবতারিণী তাদের দুজনকে তৎক্ষণাৎ নগদ একটা করে টাকা বখশিস দিয়েছেন এবং অশ্রুমতীর জবানবন্দীটাই প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছেন। চোখও টিপেছেন আরো কিছু দেবেন বলে, কিন্তু অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীরা এতোবড় সমারোহময় নাটকের এমন ঝুলে পড়া পরিসমাপ্তি দেখতে রাজী হবে কেন? তাছাড়া আসল

প্রত্যক্ষদর্শী টেঁপির মা। যে আগাগোড়া জলজ্যেন্ত চোক চেয়ে দেকেচে।

বাসনের পাঁজা ঘাটে ভিজিয়ে ঘাটের ওপাশটায় নারকেল গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল বটে বেচারী, কিন্তু চোখ তো ঘাটেই ছিল বাসনগুলোকে পাহারা দিতে :...সে দেখল না—চোরের মত ইদিক উদিক তাকাতে তাকাতে নতুন বৌদি ঘাটে নামল! গহোনা মেজেচে না হাতী। এসেই তো নেবে গেল। ...আমি বলি কী না কি! কিন্তুক চোক আমি নড়াইনি, ভাব গতিক দেকে সন্দ লাগল, তা পরে দেকি ডুব দে আর ওটে না। ত্যাখন না চীচকার মিচ্‌কার করনু। ওনারা যাই মাটে ছেলো—

এতোখানি বাহাত্তুরীর লোভ ছেড়ে দেবে সে?

আচ্ছা তা হলে গহণা হুটো? ডুবে মরার মতলবে যদি খুলেই রেখে দিয়ে থাকে তো ঘরে আছে। ...ঘোষণা করলেন ভবতারিণী, খুঁজুক তালে সেজগিন্নী।

সেজগিন্নী ঝেড়ে জবাব দেন, কোতায় কোন্ আঁদাড়ে লুকিয়ে রেকে থুয়েচে, আমি খুঁজতে যাবো কোতায়? রেকেচে কি সেই শুকনোচণ্ডী ভাইটার হাত দে পাচার করেচে তাই বা কে জানে? আসে তো সেটা মাজে মাজে।

ওদিকে অশ্রুমতীর যে মাসি উঁকি মেরেও দেখেন না কোনো দিন, সে-ই দিদির উদ্দেশে বিলাপ করতে করতে অশ্রুমতীর ভিজে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। এই পরিস্থিতির পটভূমিকায় নীলকান্ত ইস্কুল থেকে এসে দাঁড়িয়েই বলল, বাবা আসছে গৌরকাকার বাড়ি থেকে। দেখতে পেলাম।

দেড় ক্রোশ পথ ভেঙে ইস্কুলে যেতে হয়। যেতে আসতে তিনক্রোশ। গ্রামের মধ্যে তো ইস্কুল নেই। তা কটা ছেলেই আর প্রত্যহ এতো ব্যাগার খাটতে চায়? নীলকান্ত ও তার সম্প্রদায় বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে ও পকেটে নাড়ু মোয়া নিয়ে বেরোয়, খুব

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটি জায়গা নির্বাচন করে জমিয়ে বসে।...
লোকের বাগানের ফল পাকড় দেখতে পেলে তার সদ্ব্যবহার করে, ঢিল মেরে মেরে কাঁচা আম পাড়ে, পেন্সিলকাটা ছুরিটা দিয়ে কেটে নুন দিয়ে ওগুলো খায়, অবশেষে আন্দাজ মত সময়ে বইখাতা গুছিয়ে তুলে বাড়ি ফেরে।... যথাসময়ে ক্লাসে উঠলে এতোদিনে এণ্টান্স পাশ করে কলেজে পড়তে যেতে পারতো নীলকান্ত, কিন্তু বছর দু' বছরে এক একবার ক্লাশে ওঠে সে।...অথচ চন্দ্রকান্তও ছাড়বেন না। শশীকান্তর স্নেহময়ী জননীর মত নীলকান্তর জননীও বলেছিলেন, ওর দ্বারা হবে না বাপু, ওকে ছাড়ান দাও। একটা মাত্তর তো ছেলে, কত খাবে? তোমার যা খুদকুঁড়ো আছে, তাতে ওর জীবনটা কাটবে না?

চন্দ্রকান্ত কথা বলেন না, শুধু গভীর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছিলেন। অতঃপর আর কিছু বলেন নি সুনয়নী।...শুধু ছেলে যখন রোদে ঘেমে এসে দাঁড়ায়, তখন গামছা দিয়ে ছেলের মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে তার বাপের নিষ্ঠুরতা নিয়ে আক্ষেপ করেন।

আজ আর সুনয়নীর হাতে গামছা নেই, ছেলের জন্যে শুকনো কুলভিজের শরবৎ করাও নেই। সুনয়নী আধ ঘোমটা টেনে গিন্নীদের পিঠের আড়ালে বসে আছেন।...নীলকান্ত আসতেই চুপি চুপি ভবতারিণীকে বলে উঠে যান। চলে যান ছেলেকে নিয়ে দোতলায়।

নীচেরতলার দৃশ্যটা দেখে নীলকান্ত হকচকিয়ে উঠে এসেছে ইস্কুলের জামাকাপড় ছাড়তে। দোতলায় সিঁড়ির পাশে একটা অচ্ছুৎ আলনা আছে, তাতে ওই অচ্ছুৎ জামা কাপড় ছেড়ে ভিজে গামছা পরে তবে কাচা আলনায় হাত দিতে হয়।...আজ তাকে সে সময় না দিয়েই সুনয়নী উঠে এসে তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে যাহোক কিছু বোঝান।...ভবতারিণীর নির্দেশিত কথাই বলেন, পা পিছলে ডুবে গেছল নতুন খুড়ি। ভাগ্যে টেঁপির মা দেখতে পেয়েছিল।

কিন্তু চন্দ্রকান্তর কাছে প্রকৃত কথাটি বলবার জন্য প্রাণ অস্থির হচ্ছে। এমন একটা নাটকীয় ঘটনা না বলে পারা যায়?

দোতলাতেই অপেক্ষা করতে হবে, নইলে তো নির্জনে পাওয়া যাবে না স্বামীকে। অতএব প্রকাণ্ড দালানটা ঝাঁটা দিয়ে সাফ্ করতে বসেন সুনয়নী। একটা উপলক্ষ না হলে চলবে কেন? বরের অপেক্ষায় বসে আছি? ছি ছি। কেউ বুঝতে পারলে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না?

আট

কিন্তু এতো কাণ্ড হয়ে গেল, নাটকের মূল নায়ক কোথায়? শশীকান্ত? সে তো ইস্কুলেও যায় না, অফিস কাছারিতেও যায় না, দিবানিদ্রাটি তো ভালই করে।

মেজগিন্নীর এলাকা হচ্ছে নীচের তলাতেই, একেবারে একটেরে ......সাবেকী বাড়ির ন্যায্য ভাগ। দোতলাটা—চন্দ্রকান্তর বাবা কবিরাজ মশাই বানিয়েছিলেন, সেটার সবটাই চন্দ্রকান্তর। ব্যাপারটা স্বার্থপরের মত দেখতে লাগে বলে সুনয়নী বড়জেঠির সংসারের খানিকটাকে দোতলায় ডেকে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, কিন্তু ভিন্নর পর আর তো সে পদ্ধতি চলল না? ছোট খুড়ির এলাকায় ছোটখুড়ি। বাকী শুধু ভবতারিণী।

তিনি তাঁর ঠাকুর দেবতাকে একতলায় ফেলে রেখে নিজে ঠাকুরদের শিরোধার্য হয়ে থাকতে রাজী হলেন না।

অতএব একা সুনয়নী।

প্রকাণ্ড দালানটা হাঁ হাঁ করে, সারি সারি ঘর শেকল বন্ধ পড়ে থাকে। সাধে আর ছেলের বিয়ে দেবার বাসনা জেগেছে? কিন্তু ওই চিরনিষ্ঠুর মানুষটি কি কখনো সুনয়নীর ভিতরটার দিয়ে তাকিয়ে দেখেন?

তবু মনের মধ্যে কথার ঢেউ উঠলে আর কার কাছে মুখ খুলবেন?

কাকে বলবেন—যে যতই চাপুক, আমি বাবা বুঝেছি ব্যাপারটা কী!...ডুবে মরতেই গিয়েছিল নতুন বৌ, মরল না তো, এখন বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলছে। না হলে রোজ নতুন ঠাকুর পো

ঘরে দোর দিয়ে সারা ছকুর ঘুমোয়, আর আজকেই হাওয়া?…
প্রথমে তো সবাই ভেবেছিল, যেমন ঘুমোয় ঘুমোচ্ছে।…পিসিমা যখন বললেন, শশীকে ডেকে তুললো না কেন সেজবৌ? তখনও সেজখুড়ি বললেন, মরেতো আর যায়নি বৌ, একটু জলও গেলেনি। শুধু কেলেঙ্কারি। এ দেকতে আবার ব্যাটাছেলেকে ডাকবো কী?… ওমা তাপর কিনা দেখা গেল ঘরেই নেই।…কখন থেকে নেই সেজখুড়ি পর্যন্ত জানেন না।…বুঝতে পারছো ভেতরে গোলমাল?… নতুন বৌয়ের গায়ের গহনা ছটোও তো ভূতে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মতন।……ভয়ে তো তোমার কাছে সব কথা প্রকাশ করি না। কে প্রকাশ করেছে টের পেলে সেজখুড়ি কি আস্ত রাখবেন? ছেলের অনেক গুণ। নির্ঘাৎ গহনা নতুন ঠাকুরপোই সরিয়েছে। বৌ রাগ করে—

ঝাঁটা চালাতে চালাতে অনর্গল কথাগুলো মনে মনে আউড়ে যান সুনয়নী। এটা তাঁর বরাবরের মুদ্রাদোষ।

বৌঠাকরুণ যে রাগ করে ডুবে মরতে গিয়েছিলেন, তা হল খালি ধাষ্টামো! রাম বোকা তো! আত্মঘাতী হতে গেলেও বুদ্ধির দরকার। ……নতুন-বৌয়ের যা বুদ্ধি, গলায় দড়ি দিতে গেলেও হয়তো এমন দড়ি বাঁধতো যে দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যেত।……সুনয়নীর এক মাসির বড়জা—নাকি মরবার জন্যে কলকে ফুলের ফল বেটে খেয়ে পাগল হয়ে বসে আছে। যতটি খেলে মরে ততোটি খায়নি।

আমি যদি কখনো ডুবে মরতে যাই বাবা, কখনো দিন-ছপুরে নয়। সন্ধের অন্ধকার হয়ে এলে ঘাট যখন শূন্য হয়ে যায়, তখনই হচ্ছে ডুবে মরবার যুগ্যি সময়।……তাও বাবা যদি মরি তো গলায় কলসী বেঁধে কলসীর মধ্যে পাথর পুরে।

হঠাৎ মনে মনে হেসে ওঠেন সুনয়নী, আ আমার মরণদশা। মরতে গেলে কেমন বুদ্ধি খাটাবো, এমন অনাছিষ্টি কথা ভেবে মরছি কেন?…অবিশ্যি মাঝে মাঝে ওই মানুষটির ওপর রাগে অভিমানে

মরতে ইচ্ছে যায়। কিন্তু তাতে ওনার এতোটুকু লোকসান হবে? জব্দ হওয়া তো দূরে থাক, হয়তো টেরও পাবেন না।......তবে শুধু শুধু নীলেটাকে মা-হারা করে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাই কেন?

কিন্তু দোতলায় কি তিনি আসবেন না আজ জামা-কাপড় ছাড়তে? কই পাত্তা নেই কেন?......পিসির কাছে আদ্যোপান্ত শুনছেন বোধহয়।

আরো কত শুনতে হবে। আছেন তো কতজনা।

সাড়া-শব্দ আর পাচ্ছিনে। ওনাকে দেখে ঠাণ্ডা মেরে গেছে সবাই মনে হচ্ছে।...এতোক্ষণ তো যাত্রাথিয়েটারের মহল্লা চলছিল।

অস্থির সুনয়নী যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে যাচ্ছেন তখন দেখতে পেলেন চন্দ্রকান্ত আসছেন। তার মানে সব শুনেটুনে। যাক, যা শুনেছেন তা-তো ভুয়ো।

প্রকৃত কথাটি কোন দিক থেকে শুরু করবেন মনে মনে গাঁথতে থাকেন সুনয়নী।.......

সুনয়নী কি জানেন, তিনি নাটকের যে দৃশ্য দেখতে দেখতে চলে এসেছেন, সে দৃশ্যে যবনিকাপাত হয়ে গেছে?

বাবা আসছেন বলে নীলকান্ত চলে এসেছে, পিছনে পিছনে সুনয়নীও। সঙ্গে সঙ্গে যেন ভোজবাজির মত মুহূর্তে মঞ্চের সমস্ত কুশীলব অন্তর্হিত। শূন্য মঞ্চে আসন্ন সন্ধ্যার স্তব্ধ শান্তি।...কিছুক্ষণ পরে আবার শব্দ উঠবে। শঙ্খধ্বনির।

বহিরাগতরা চটপট বিদায় নিলেন উঠোনের দরজা দিয়ে। ছোটগিন্নী তাড়াতাড়ি কাপড় কাচতে চলে গেলেন টেঁপির মাকে সঙ্গে নিয়ে। যদিও মৃত্যু ঘটেনি, তবু যেন পুকুরঘাটের দিকে ভূতের আতঙ্ক।

এদিকে নিবারণী অশ্রুমতীকে প্রায় মাদুরসুদ্ধ হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে ফেলেছেন এবং নিজেও ঘরেই রয়ে গেছেন।

কেবলমাত্র ভবতারিণীই নির্বিকার। তিনি যথারীতি ঠাকুর ঘরের দরজার পাশে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে আছেন।……

সন্ধে দেওয়া আর শাঁক বাজানো দুটি কাজ ছোটগিন্নী ননীবালার। ঘাট থেকে এসেই নিজ কর্তব্য করবেন।

চন্দ্রকান্তর বারবাড়ি থেকে ভিতর বাড়িতে আসতেই এতো কাণ্ড হয়ে গেল, অতএব চন্দ্রকান্ত কোনো ব্যতিক্রম দেখতে পেলেন না।

ওঁকে ঢুকতে দেখেই ভবতারিণী বলে উঠলেন, কী-রে চন্দোর, খুব নেমন্তন্ন খেলি দেখছি।……দুপুরের ভোজে বিকেল গড়িয়ে গেল। তা কী রেঁধেছিল গৌরের বৌ, বল?

নয়

নীচের তলায় দিশ্য দেখে বুঝি আর উঠে আসতে পারছিলে না ?······

সুনয়নী বলে ওঠেন, তবু তো ভগবান রক্ষে করেছেন। নইলে যে এখন বাড়ীতে কী দক্ষযজ্ঞ হতো !

চন্দ্রকান্ত থমকে দাঁড়ান।

কী ব্যাপার ?

কী ব্যাপার ! দেখে এলে না নীচের তলায় ?

চন্দ্রকান্ত মনে মনে একবার ভেবে নিয়ে বলেন, কই ! কিছুই-তো দেখলাম না।

কিছুই দেখলে না ?

না-তো !

কী দেখলে ?

যেমন রোজ দেখি। কেউ কোথাও নেই, পিসি বসে আছেন সন্ধেটির অপেক্ষায়। সন্ধে হলে মালা ধরবে।

ও-মা সে কি।

সুনয়নী গালে হাত দেন, কেউ কোথাও নেই ?

কেন ? কী হলো ?

সুনয়নী বলেন, হয়েছে অনেক কাণ্ড। শুনো পরে। তোমার আসার সাড়া পেয়ে পাখিরা সব উড়ে পালিয়েছে বোধহয়।······ নতুন বৌকেও দেখতে পেলে না ?

নতুন বৌ !

ওমা, নতুন বৌ কে তা জানো না ? ঠাকুরপোর বৌ। টেবু থেবুর মা—

আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি। বুঝেছি। তা তিনি হঠাৎ? তাঁকে তো কোনদিনই—

তার মানে পিসিমা কিছুই বলেন নি—

নাঃ, এসব হেঁয়ালি বোঝা আমার অসাধ্য। বাইরের জামা-কাপড়গুলো ছাড়তে দাও তারপর তোমার হেঁয়ালী শোনা যাবে।······

হঠাৎ কোথা থেকে যেন নীলকান্তর দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত গলা ভেসে আসে, হেঁয়ালী কী জানো বাবা? আজ নতুন খুড়ি খিড়কির পুকুরে ডুবে মরছিল।

দশ

অনেক দিন পরে সারাদিন বন্ধু সঙ্গ লাভে মনটা বড় ভাল লাগছিল—আকাশ বাতাস, গাছ পালা।

গল্প করা কাকে বলে সে কথা তো ভুলেই গেছেন চন্দ্রকান্ত। চন্দ্রকান্তের যা চিন্তার জগত সেখানকার নাগাল পাবার মত লোকই-বা কোথায় এখানে?···চন্দ্রকান্তর অধীত গ্রন্থ সম্পর্কে কে এমন ওয়াকিবহাল যে তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা চলে!

কেউ নেই, কেউ নেই।

চন্দ্রকান্তের সঙ্গে তাদের আকাশ-পাতাল ব্যবধান।···মেজদা তো একটা পাশ করা, দেখগে যাও তাকে। কে বিশ্বাস করবে?··· সারা সকাল গরু হেট হেট করছে, তারপর তাদের জন্য খড় কাটছে, খোল মাখছে, ভুষি মাখছে, গোটা কতক গরু পুষে তাই নিয়েই মশগুল।

অথচ কেউ যে নেই, সে কথাটা আজ দশ বছরের মধ্যে মনে পড়েনি।

দশ বছর পরে আজ বন্ধু সঙ্গের আস্বাদ পেয়ে মনে পড়ল, বড় নিঃসঙ্গ তাঁর জীবনটা।

ভাল লাগার আরো একটা কারণ, গৌরমোহনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে ঠিক করে ফেলেছেন—একবার কিছু দিনের জন্যে কলকাতায় যাবো।

কলকাতা যাবো। কলকাতা যাবো।

একটা যেন আনন্দের গুঞ্জন ধ্বনিত হয়ে চলেছে মনের মধ্যে।

আশ্চর্য! এই দীর্ঘকালের মধ্যে একবারের জন্যেও যাইনি কেন?

শুধুই কি সময়ের অভাব ?

তা নয়। যেন একটা অভিমান বাধার প্রাচীর হয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে অটল হয়ে।

কার উপর অভিমান ?

হয়তো আপন জীবনের উপরই।

না কি ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা ধ্বংস করে দিয়ে যাঁরা একটা কিশোরছেলেকে বিবাহিত বলে দেগে দিয়েছিলেন তাদের উপর ?

ভুলে গিয়েছিলেন। আজ আবার হঠাৎ—

বহুদিন পূর্বে শ্রুত একটা ব্যঙ্গ-র হাসির ধ্বনি কানে বেজে উঠল, ওমা! এইটুকুন ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে ? ছি ছি !......

একটা 'এইটুকুন' মুখ থেকেই উচ্চারিত হয়েছিল, তবু ভয়ানক একটা দাহ সেই ছেলেটাকে যেন ঝলসে দিয়েছিল।......হয়তো সেখানেও জমে উঠেছিল একটা তীব্র অভিমান।...আর একদা যে উদার ধর্মছত্রতলে আশ্রয় নেবার জন্যে উদভ্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন চন্দ্রকান্ত, সেও তো চন্দ্রকান্তর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল।......

চলে আসার সময় মনে হয়েছিল চন্দ্রকান্তের, কলকাতা যেন তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

একটা খোলা রাস্তার দরজায় তালা চাবি লাগিয়ে দিয়ে তার দিকে পিঠ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকার মত এই গ্রামের জীবনে নিজেকে ফেলে রেখেছেন চন্দ্রকান্ত। ধীরে ধীরে বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করে নিতে চেষ্টা করেছেন এবং সমস্ত অরুচিকর জিনিসগুলিকে সহ্য করে নেবার শক্তি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে চলেছেন।

তবু সহ্য হওয়া বড় শক্ত।

প্রহার সহ্য করা যায়, 'হার' সহ্য করা বড় কঠিন।

যাক, তবু আজ একটা আনন্দের সুর বাজছিল মনের মধ্যে। গৌরমোহনের মুখে বর্তমান কলকাতার কিছু কিছু ছবি একটু উদ্বেল করে তুলেছে। মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করে কেন একটা মুক্তির

পথ বন্ধ করে রেখেছি এতোদিন ?···অনেককে বোকা ভাবি, আমিও তো কম বোকা নয় ?····

নীলকান্তকে যদি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কলেজে পড়াতে পারতাম ! আমার বাবা অতদিন আগে তার ছেলের সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন, আমি তা পারছি না। এ বিষয়ে ভাবা দরকার।

কিন্তু পরামর্শ করবার লোক কোথায় ?

জীবনের দোসর নেই চন্দ্রকান্তর।

তবু আসছিলেন উৎফুল্ল মনে। কলকাতায় যাবার কথাটা পাড়া যাবে কীভাবে ভাবতে ভাবতে। প্রথমেই তো পিসিমা।···কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে সেখানে ? তারপর আর একখানা মুখ।

কিন্তু বাড়ি এসে সেই মুখ থেকে এমন একটা অভাবনীয় কথা শুনলেন।···যেটা চন্দ্রকান্তর হিসেবের বাইরে ছিল। শশীকান্ত বৌকে ধরে 'ঠেঙায়' এই ব্যাপারটা যখন বাড়ির প্রত্যেকে অতি সহজে উড়িয়ে দিল, প্রায় মায়েদের ছেলে ঠেঙানোর মতই স্বাভাবিক বলে ধরে নিল— তখন চন্দ্রকান্তও আর ও নিয়ে উচাটন হননি।

এখন আবার এ কী খবর ?

সুনয়নী দোতলার দালানের জানালা দিয়ে পানের পিক্ ফেলে সরে এসে বললেন, আমি তামা তুলসী গঙ্গাজল হাতে নিয়ে বলতে পারি, গহনা নতুন ঠাকুরপোই মেরে ধরে কেড়ে নিয়েছে। সেই দুঃখে নতুনবৌ, তবে এও বলি, তিন তিনটে কচি বাচ্চা তোর, তাদের মুখ চাইলি না ? তাদের দুগ্‌গতির কথা ভাবলি না ? মায়ের প্রাণ না, পাষাণ বাবা ! মরলি না, বেঁচে উঠলি তাই, নইলে অ্যাতোক্ষণ কী ধুন্ধুমার লাগিয়ে দিতো মেয়ে তিনটে ভাবো ?

থামো।

চন্দ্রকান্ত বললো, কে পাষাণ সে হিসেব করার বুদ্ধি থাকলে— যাক শশী কোথায় ?

ওই তো বললাম, আজ একেবারে বেপাত্তা। অথচ রোজ থাকে। আমার বিশ্বাস সেজখুড়ি জানেন সন্ধান। তা নইলে একটু হানফানালি দেখলাম না কেন!···যাই বলো বাবু, গুরুজন হলেও বলছি, যত নষ্টের গোড়া ওই মা'টি—

আঃ! তুমি থামবে?···নীলকান্ত, তুমি জানো শশী কোথায় যেতে পারে?

নীলকান্ত অদূরে বসে একটা ছেঁড়া ঘুড়ি ময়দার আঠা দিয়ে তাপ্পি লাগাচ্ছিল। বাপের কথায় বলে উঠল, খুব জানি।

কোথায়? কোথায় গেছে?

কোথাও নয়—

নীলু কাছে সরে এসে গলা নামিয়ে বলে, বাড়িতেই লুকিয়ে আছে।

বাড়িতে!

নীলু আঙুল উঁচিয়ে ছাদ দেখিয়ে দিয়ে আরো চুপি চুপি বলে, বড়ি আচারের ঘরে। সেজঠাকুমা লুকিয়ে রেখেছে। একটু আগে খাবার দিতে ঢুকেছিল, দেখতে পেলাম। আমি যে ওই কোণায় ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলাম তা দেখতে পায় নি বুড়ি।

আঃ নীলকান্ত!···চন্দ্রকান্তের মনে হল, তিনি কি কোনো কালে ওই ছাদটায় উঠেছেন? বড়ি আচারের ঘর! সেটা কী জিনিস। আমায় দেখিয়ে দিতে পারো?

পারবো না কেন? কিন্তু কাকাকে দেখতে পাবে না। সেজ ঠাকুমা কুলুপ লাগিয়ে রেখে গেছে।···

আচ্ছা সেজঠাকুমাকেই একবার। আচ্ছা থাক, আমিই যাচ্ছি। তুমি এ নিয়ে কাউকে কিছু—

চন্দ্রকান্তর কথা শেষ হয় না, হঠাৎ বাইরের দেউড়িতে বিরাট একটা রোল ওঠে। অনেকগুলো কণ্ঠের প্রচণ্ড চীৎকার।

এগারো

ভরা দুপুরে চন্দ্রকান্তর সংসারে যখন একটা চাপা উত্তেজনার স্রোত বইছিল অশ্রুমতিকে নিয়ে, তখন গ্রামের আরও একটা জায়গা উত্তেজনায় থমথম করছিল।

এ উত্তেজনা দুলে পাড়ায়।

মেয়ে পুরুষ ছেলেবুড়ো এসে জড়ো হয়েছে বদন দুলের বাড়ির সামনের পোড়ো জমিটায়। সকলের মুখে উত্তপ্ত উত্তেজনা, গভীর উদ্বেগ। কারুর মুখে কোন কথা নেই। শুধু বুড়ো উদ্ধব কাঁপতে কাঁপতে হাঁপাতে হাঁপাতে সবাইকে ধরে ধরে কী যেন বোঝাতে চেষ্টা করছে।···কারুর কারুর মুখে মেনে নেওয়ার ছাপ, অধিকাংশের মুখেই অনমনীয়তার ভঙ্গী।

জোয়ান ছেলেগুলোর সকলের হাতেই লাঠি। মাঝে মাঝে কেউ কেউ অসহিষ্ণু ভাবে লাঠিটা মাটিতে ঠুকছে। সকলের মাঝখানে ভীষণতার প্রতিমূর্তির মতো মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে বদন দুলে। কালো পাথরে কোঁদা গড়ন, ঘাড়ে বাবরি চুল, সেই বাবরি চুলের আবেষ্টনীর মধ্যে ভীষণাকৃতি মুখটা সমেত বদনকে কেশর ফোলানো সিংহের মত দেখতে লাগছে।

কথা নেই, গুঞ্জন আছে।

আগুন নেই, উত্তাপ আছে।

এই অবস্থা থাকতে থাকতেই আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নেমে আসছিল। হঠাৎ সমস্ত জটলার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। আর কর্কশ অনার্য কণ্ঠের সমবেত হুংকার। মেয়েমানুষদের গলা থেকেও তার সমর্থন ওঠে।

দুলেবস্তির ভেতর থেকে একটা দল বেরিয়ে আসছে জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে। আসন্ন সন্ধ্যার আকাশের নীচে সেই মশাল হাতে কালো পাথুরে মানুষগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে, আদিম অরণ্য থেকে উঠে আসা গুহামানবের দল।

তবু উদ্ধব দুলে ওই কঠিন সংকল্পের মূর্তিগুলোর কাছে আবেদন জানাতে চেষ্টা করছিলো, অ্যাকনো সময় আছে বাবারা, মগজ ঠাণ্ডা করে ভেবে গ্যাক—অ্যাকবার। একটা বজ্জাত মেয়েছেলের নেগে অ্যাতোটা করতে যাবি কিনা! গোরা পুলিশদের মুকগুলান মনে আন বাবারা—

কেউ উদ্ধবের আবেদনে কর্ণপাত করছে বলে মনে হয় না। গ্রাহ্যও করে না। তারা শুধু বদনের মুখ থেকে শেষ হুংকারের অপেক্ষায় অসহিষ্ণু মুহূর্ত গুণছে।

উদ্ধব যেই বদনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, উঠল সেই হুংকার। 'যা ঘর যা বুড়ো'—

উদ্ধবকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে আওয়াজ তুলল বদন।.....

মেয়েছেলেরা কেউ যাবেনি।

পড়ল আর একটা বাজ!

যাবেই বা কী করে? তাদের ঘর আগলানো আছে, শিশু সন্তান আছে। তবু কটা ডাকবুকো মেয়ে যাচ্ছিল পিছু পিছু। ফের ধমকে উঠল বদন, তফাৎ যা।

উদ্ধব ককিয়ে ওঠে, লাসটার কী হবে রে বদন?

খবরদার। একদম চুপ। জিভ টেনে ছিঁড়ে দেব। যা হবার ফিরে এসে হবে।

মশাল হাতে রে রে করে এগিয়ে এসেছে তারা সেই বাড়ীর দেউড়িতে, যে দেউড়ির ধুলোর উপর তাদের বাপ-ঠাকুর্দারা চিরদিন সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে প্রণিপাত জানিয়েছে।

কোতায় সেই হারামজাদা শুয়োর। বের করে দে

সেটাকে। তার চামড়া ছাইড়ে নেই। বেরিয়ে আয় শুয়োরের বাচ্চা।

অন্ধকার নেমে এসেছে। গাঢ় গভীর অমাবস্যার রাত্রি। সেই জমাট অন্ধকারের গায়ে মশালের আগুন যেন ক্রুদ্ধ দৈত্যের চোখের মত জ্বলছে। মাঝে মাঝে বাতাসের ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে ওঠায় ভয়াবহতা আরো প্রখর প্রকট।

* * *

তুমি কি খেপে গেলে? ওই রাক্কসদের মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে তুমি?

সুনয়নী লোকলজ্জা ভুলে সকলের সামনে চীৎকার করে ওঠেন।

চীৎকার করে ওঠেন ভবতারিণীও। ও বাপ, তোর হাতে ধরি। ওদের সুমুকে যাসনে।

না গেলে ওরা দেউড়ি ভাঙবে।

নোয়ার দেউড়ি ভাঙলেই হলো?

ওরা যদি খেপে ওঠে, পৃথিবী ভাঙতে পারে পিসিমা। ভদ্দরলোকের রক্তর মত ঠাণ্ডা রক্ত নয় ওদের। ধরতে এসোনা। দেখতে দাও আমায়, শুনতে দাও ওদের কথা।

গিয়ে দাঁড়ালেন দেউড়ির সামনে। নিজের হাতে প্রকাণ্ড ভারী তালাটা খুলে ধরলেন।

হঠাৎ থেমে গেল আওয়াজ।

স্তব্ধতা নামল একটু।

চন্দ্রকান্ত বললেন, কী চাও? লুঠ করবে? চলে এসো।

কে একজন বলে উঠল, আমরা ছোটলোক হতে পারি হুজুর, বেইমান নই।

তবে, বল কী দরকার?

আর কিচ্ছুতে কাজ নাই আমাদের হুজুর, শুধু—

হুজুর হুজুর রাক্—

বদনের কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষ, সেই শূয়োরের বাচ্চাডারে বের করে দ্যান।

আবার হুংকারের রোল ওঠে।

চন্দ্রকান্ত অবশ্যই কিছু অনুমান করেন, তবু শান্ত কণ্ঠে বলেন, ভালভাবে কথা বল বদন, কে সে?

ক্যানো? মালুম হচ্ছেনি? তোমার ওই ভাইডা। শালাকে ভালকুত্তাকে দে খাওয়াবো।

শোনো, আমাকে বুঝতে দাও। কী হয়েছে বলতে হবে। আমি কিছুই জানি না।

চন্দ্রকান্তর দুটো হাত দুটো দেউড়িতে। মশালের আলোয় বিচিত্র একটা রূপ।

আবার কিছুটা নীরবতা। যারা আগুন লাগাবে বলে মশালগুলোকে নাচাচ্ছিল, তারা বেজার মুখে হাত থামায়। আর শক্ত মুখ একটা মাঝারি বয়সের লোক সরে আসে চন্দ্রকান্তর দিকে।

কি হয়েছে জানায়—

বদনের সংসারে আর কেউ নেই, না মা না ছাঁ, শুধু একটা ডব্‌কা বয়সের বাচাল বৌ। বদন যখন কাজে যায়, তখন বৌকে তালা বন্ধ করে রেখে যায়। বন্ধ ঘরের মধ্যে সে খায়, ঘুমোয়, গাল পাড়ে। বদন এসে তার তালা খোলে। কিন্তু কিছুদিন থেকে ওই শয়তান শশীকান্তকে বদনের বাড়ির ধারে কাছে ঘুর ঘুর করতে দেখেছে অন্য মেয়েছেলেরা। বদন গোঁয়ার বলে চট করে বলে দিতে সাহস করেনি। কিন্তু বদনও যেন সন্দেহ করেছে ঘরে আর কেউ আসে। অথচ তালা ঠিকই ঝোলে।

মাঝে মাঝে বদনকে কাজের জন্য ভিন গাঁয়ে যেতে হয়, রাতে ফেরে না। সেদিন ডবল তালা লাগিয়ে রেখে যায়, তবু সন্দেহ জমাট হতে থাকে। আর বদন হিংস্র হতে থাকে।

কিন্তু কাউকে কেন পাহারা দিতে রেখে যায় না বদন ? ওইতো !
ওখানেই গোঁয়ার্তুমি। নোকে জানবি পরিবারকে এঁটে উটতি পারবে না বদন ছুলে, অপরের সাহায্য নিতে হচ্চে।

তা তক্কে তক্কে থাকে বদন।

আজ সকালে মিচে করে বলেচে বেরুচ্চি। আজ আর আসবুনি —ব্যস, বজ্জাত মেয়েমানুষটা জো পেইচে—।

অতঃপর আর কি !

হাতে নাতে ধরা।

দিনছুপুরেই এসে হাজির হইচে 'কবরেজ মোশায়ে'র কুলাঙ্গার ভাইপোটি—

তো যেই না বদনা ছুয়োরের তালাচাবি খুলেচে, সেই নক্কীছাড়া পাজী ঘরের পেচন দে দৌড় দে দৌড়। বদনা দেকে সিঁদেল চোরের মতন কাণ্ড! ভিতের গোড়ায় ইয়া একখান সিঁদ। তলেতলে কেটে রেকে থুয়েচে, তার মুকে একখান প্যাঁটরা ঠেশে থুয়েচে কুসমি।

না। বদন তো আর সিঁদের গর্ত দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ধরতে যেতে পারে না, দরজা দিয়ে বেরিয়ে ছুটেছে। দেখতে পায়নি।...ব্যাস, তখন অপর আসামীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং দিশেহারা রাগে এমন পিটন পিটিয়েছে যে, মরেই গেছে 'কুসমি' নামের সেই জ্বলজ্বলে ছটফটে বাচাল বেহায়া মেয়েটা। এতো শাসনেও যার মুখের হাসি কমতো না।

কুসুমের কোল-আঁচলের খুঁটের নাকি একজোড়া সোনার বুলি, আর একগাছা বিছেহার বাঁধা ছিল। নিয়ে এসেছে বদন।

বের করে ত্যাকানা বদন, সনাক্ত করুক ইনি।

বদন রুক্ষ গলায় বলে, উনি কি সনাক্ত করবে! আসামীকে বের করে দেক। সেটাকেও 'লাশ' করে দেব, তাপর মড়ার মুকের ওপর এই গয়োনা ছুখান ছুঁড়ে মেরে ফাঁসিকাটে ঝুলতি যাব, ব্যাস। দেন, বের করে দেন।

আচ্ছা, দিচ্ছি।

যে লোকটা চন্দ্রকান্তর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আপোসের সুরে কথা বলছিল, সে নীচু গলায় বলে, পরিবারডারে প্রাণতুলি্য দেকতো হতভাগা, রাগের চোটি খুন করি ফ্যালে পাগলা বনি গ্যাচে।

ভিতরে চলে এলেন চন্দ্রকান্ত। মহিলাকুল যেখানে এক জায়গায় জড়ো হয়ে বসে আছেন নীলকান্তকে এবং ছোট ছোট মেয়ে তিনটেকে নিয়ে, সেখানে এসে বিনা ভূমিকায় গম্ভীর গলায় বলেন, ছাদের বড়ি আচারের ঘরের চাবিটা দাও সেজখুড়ি।

সেজখুড়ি চমকে উঠে বলেন, ওমা সিকি! সে ঘরের চাবি নিয়ে কী করবে অ্যাখোন তুমি? আকাচা কাপড়।

থামো। আর পবিত্রতা দেখাতে এসোনা। চাবিটা দাও।···

সুনয়নী ঠকঠক করে কাঁপেন। ঠকঠক করে কাঁপে নীলকান্ত। কাঁপতে থাকে অশ্রুমতীও।

শুধু ভবতারিণী, ননীবালা, টেঁপির মা অবাক হয়ে তাকান। হঠাৎ এটা কোন ভাষা!

ভবতারিণী ভয়ে ভয়ে বলেন, চলে গেচে ওরা?

চলে যাবে? শুধু হাতে চলে যাবে?

তবে উমনোর মধ্যে ঝুমনোর বাচ্চি বড়ির ঘরের চাবির খোঁজ কেন বাবা? আমাদের তার মধ্যে ঢুকিয়ে দে লুটতরাজ করতে ছেড়ে দিবি?

লুঠতরাজ করতে আসেনি ওরা। কথা পরে হবে। চাবিটা দিয়ে দাও সেজখুড়ি।

আর ছলনা চলবে না।

অতএব এবার নিবারণী বাঘিনীর মূর্তিতে রুখে দাঁড়ান, ক্যানো? তোমার হাতে চাবি দিতে যাব ক্যানো? আপনার প্রাণ বাঁচাতে আমার শিবরাত্তিরের সলতেটুকুকে রাক্কোসের মুকে ধরে দেবে বলে? ···চাবি? আমি দেব না। এই চললাম দুয়োর আগলাতে, দেকি আমায় না খুন করে কে দুয়োর খোলে!

চন্দ্রকান্ত সকলের মুখের দিকে তাকান।

বাইরে আবার যেন কলরোল উত্তাল হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত শান্ত গলায় বলেন, মহাপাপের মহা প্রায়শ্চিত্তই করতে হয় সেজখুড়ি।···ছেলে যদি তোমার খুন হয়, তো জেনো সে খুনের খুনী তুমি। তবু আজ আরও একটা খুনের হাত থেকে দৈবে রেহাই পেয়েছ। নইলে পুলিশ এতোক্ষণে সবাইয়ের হাতে দড়ি পরাতো। যাক, বলছি ভালয় ভালয় ওদের হাতে ধরে দিলে বরং রেহাই পেতে পারে হতভাগা। ধরে না দিলে বাড়ি জ্বালিয়ে দরজা ভেঙে টেনে বার করে নিয়ে গিয়ে আছড়ে মারবে।

কিন্তু এই আশ্বাসেই কি চাবিটা ফেলে দেবেন নিবারণী? তাই কি সম্ভব?

নিবারণী ক্রুদ্ধ গর্জনে বলেন, যা পারে করুক। আমায় না মেরে ওরা শশীর চুলের ডগাটুকু ছুঁক দিকি। পরের ছেলে বলে এতো সাউখুড়ি। বলি এ যদি তোমার নিজের ছেলেটি হতো?

চন্দ্রকান্ত কঠিন গলায় বলেন, যদি আমার নিজের ছেলে হতো? নিজের হাতে সে ছেলের টুঁটি ছিঁড়ে মেরে ফেলতাম।

নিবারণী উঠে দাঁড়ান।

কোমরের কাপড়টা ভালো করে জড়িয়ে নেন, যাতে চাবিটা কেউ কেড়ে নিতে না পারে। নিবারণীকে ডাকিনীর মত হিংস্র দেখতে লাগে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন, আচ্ছা দেখবো। ছেলে জোয়ান হয়ে উঠতে আর ক'দিন? মরবো না তো। দেখবো সবই। তা তুমি মহাপুরুষ নিজের ছেলের টুঁটি ছিঁড়ো বাছা, আমার ছেলেকে শাসন করতে আসার কিসের এক্তিয়ার তোমার? আমরা তোমায় মান্যিমান করে চলি তাই? নচেৎ শাসন করবার তুমি কে? বাপ না, জ্যাঠা না, খুড়ো না, জ্ঞেয়াতি দাদা।···কই আর তো কেউ কিছু বলতে আসে না? দুটি ভাত দাও বলে?

চন্দ্রকান্ত স্তব্ধ হয়ে যান।

ওদিকে দেউড়ি ঝনঝন করে ওঠে। রব ওঠে—জয় মা চণ্ডী।

চন্দ্রকান্ত বেরিয়ে আসেন। হাত জোড় করেন। শান্ত গলায় বলেন, বার করে এনে দিতে পারলাম না বাবা। মাপ চাইছি। তোমরা তোমাদের ইচ্ছে মত যা পারো করো। বাড়ি জ্বালিয়ে, আমায় বেঁধে রেখে, মেরে—যেভাবে খুশী।

বারো

নাঃ, ওদের খুশীমত কিছুই করেনি ওরা।

ওরা কিছুক্ষণ জটলা করে আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিল। ওদের হাতের মশালগুলো তখন নিভে গেছে। অন্ধকারে কালো কালো মানুষগুলো আরো চাপা একটা অন্ধকারের মত চলে গিয়েছিল আস্তে আস্তে।

টগবগিয়ে ফুঠে ওঠা রক্তগুলো শুধু শুধু ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ায় ওদের যেন কেমন ঝিমোনো ঝিমোনো লাগছিল। বদনাকে দুজনে দুদিক থেকে ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

ওরা জানে, বাড়ি পৌঁছেই বদন কুসমির মড়াটাকে নিয়ে আছড়া আছড়ি করে কাঁদবে।...

তবে ওরা কেউ জানে না, কখন বদন দেউড়ির সামনের ধুলোর মধ্যে সেই গহনা দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। ঠিক সেইখানে, যেখানে ওর বাপ দাদা সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে এঁদের প্রণিপাত করতো।...

চন্দ্রকান্ত গুপ্তের বাড়ির এতোটুকু কিছু টস্‌কায়নি। একখানা ইঁটও খসেনি, একটু বালির চাপড়া ধ্বসেনি। লুঠতরাজের কথা তো ওঠেই না। ...শুধু সারা গ্রামে টী টী পড়ে গিয়েছিল।......

এতো মহাপুরুষ, ত্যাঁতো মহাপুরুষ, বই লিখিয়ে পণ্ডিত—স্বার্থের সময় দেখো। লুঠতরাজ বাঁচাতে ওই ছুলে ডাকাতদের সামনে খুড়তুতো ভাইটাকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন। নেহাৎ না কি সেজগিন্নি সিংহবাহিনী মূর্তিতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই তারা মানে মানে সরে গেল। নচেৎ কী হতো?

এটা যে চন্দ্রকান্তর খুব গর্হিত কাজ হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কী? সত্যিই তো, খুড়তুতো ভাইকে শাসন করতে আসার তুমি কে?…একদা সেজকর্তা বাড়ির নিজের দিকে ভাগ বেচে দিয়ে টাকা নিয়েছিলেন, আর তুমি বদান্যতা দেখিয়ে তাদের সেই বেচে দেওয়া মহলে থাকতে দিয়েছিল, এই অহঙ্কারে? বেশ্ তো, গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দাও। শশীকান্ত স্ত্রী কন্যে আর বিধবা মাকে নিয়ে গাছতলায় থাকবে, তাও ভাল।…এমন নির্মায়িক শত্রুপক্ষের আশ্রয়ে থাকার চেয়ে গাছতলা শ্রেয়।……

যাঁরা এযাবৎ 'বাবাজীবন' বলে বিগলিত হতেন, তাঁরাও এসে এসে বলে যাচ্ছেন, কাজটা চন্দ্রকান্তর ঘোরতর গর্হিত হয়েছে…গাঁয়ে ঘরে কি ওই একটা মাত্তর ছেলেই তুলে বাগদীপাড়ায় ঘুরঘুর করে? 'বয়েসকালের দোষ' কথাটার তবে সৃষ্টি হয়েছে কেন? তাছাড়া বেচারার স্ত্রীটি যখন রোগগ্রস্ত। গোঁয়ারগোবিন্দ বদনা তুলে নিজে রাগের মাথায় পরিবারটাকে পিটিয়ে মেরে এসে ক্ষেপে গিয়ে যা তা বলল বলেই তুমি খুড়িকে জবরদস্ত করে চাবি নিতে গেলে? বিধবা খুড়ি, ওই সবেধন নীলমণিটুকু নিয়ে তোমার আশায় বিশ্বাস করে রয়েছে।

জনে জনে ওই কথাই বলছে।

ওই বিশ্বাস শব্দটাও ব্যবহার করেছে প্রায় সবাই।

তার মানে চন্দ্রকান্ত তাঁর পারিবারিক জীবনে ভয়ানক একটা বিশ্বাস ভঙ্গ করে বসেছেন।

সুনয়নীর মনের মধ্যেও সেই ভয়। তাই চন্দ্রকান্তর যাত্রাকালে সে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে সেই কথাই বললেন।

এমনিতে চন্দ্রকান্তর কলকাতায় বাসা করার সংকল্প শোনা পর্যন্তই সুনয়নী সবাইকে ধরে ধরে শুনিয়ে চলেছেন, আমি যাবো কী বল? বেটাছেলের খেয়াল ক'দিন থাকে কে জানে! আমি মরতে ল্যাজ ধরতে যাবো কেন? বাসায় সেই পায়রার খুপরি

হুখানা ঘরের মধ্যে আমি টি'কতে পারবো? হাঁপিয়েই মরে যাবো তো। বেশ থাকবো বাবা আমি পিসিমাদের কাছে—

কিন্তু চন্দ্রকান্তর বিদায়কালে সুনয়নী পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে চোখ মুছে ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, এখন আর কী বলবো! কলকাতায় বাসা নিচ্ছ শুনে মনটা হুলে উঠেছিল, ভেবেছিলাম চলে যাব তোমার সঙ্গে। কিন্তু সে ভরসা আর নেই। যা নির্মায়িক প্রাণ তোমার, আমার নীলু যদি কখনো একটা অকাম করে বসে, তুমি তার কী শাস্তি করবে তুমিই জানো। হয়তো হুকুম দেবে—পাপ করেছে, আগুনে ফেলে দাও ছেলেকে। প্রাচিত্তির হোক। তা তুমি বলতে পারো, তোমায় বিশ্বাস নেই।

বিশ্বাস নেই। চন্দ্রকান্তর উপর আর কারো বিশ্বাস নেই। অথচ নিজে চন্দ্রকান্ত এপর্যন্ত আত্মবিশ্বাসের নৌকোয় চেপে তরতরিয়ে পার হচ্ছি ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলেন। হয়তো এ আঘাতের দরকার ছিল। ভালই হল, মোহমুক্ত হলেন। আর চন্দ্রকান্তকে দায়িত্ববোধের ভারে ঝুঁকে পড়ে আটকে থাকতে হবে না।

গ্রাম থেকে স্টেশন ষোল মাইল দূর, গরুর গাড়ির পথ। শেষ রাত্তিরে গাড়ি নিয়ে এসে বসে আছে জয়দ্রথ, ঠিক সময় পৌছে দেবে। এখন থেকে না ছাড়লে ট্রেন ধরা শক্ত।

কুপী জ্বেলে গাড়ি ঠিক করেছে জয়দ্রথ। প্রদীপ ধরে গাড়িতে উঠলেন চন্দ্রকান্ত। চারিদিকে অন্ধকার। খোলা মাঠ, দূরে দূরে এক একটা গাছ, ঝাঁকড়া চুল মানুষের মত দেখতে লাগছে।

গাড়ির কাঁাচ কোচের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। যেন বিশ্ব চরাচর একটা জাল মুড়ি দিয়ে বসে আছে।

গরুরগাড়ির কতটুকু গতিবেগ? গাড়ি চলেছে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে।

গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। হুদিন আগে পর্যন্তও কি ভাবতে পারতেন চন্দ্রকান্ত—এই গ্রামটাকে চিরতরে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, অথচ মনে কোনো বেদনা আসছে না···যেন সুখ দুঃখ আনন্দ

বেদনার বাইরে একটা অনুভূতিহীন অনুভূতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

কিন্তু সেই দুদিন আগে কি 'চিরতরে ছেড়ে যাচ্ছি' এমন কথা ভেবেছিলেন চন্দ্রকান্ত? ভাবা সম্ভব ছিল? অথচ আজ নিশ্চিন্ত সংকল্পে গাড়িতে এসে উঠছেন। এখন হঠাৎ হঠাৎ এক একটা পাখি ডেকে উঠছে। নিথর প্রকৃতিতে জীবনের স্পন্দন জাগছে।

কি জানি কেমন ঠিক করেছে গৌরমোহন বাসাটা। কি জানি কেমনতর পরিবেশ।

আশ্চর্য! এখন সুনয়নী বললেন, মনটা দুলে উঠেছিল। সুনয়নীরও মন দুলে ওঠে? জগতে তাহলে এ ঘটনাও ঘটে? কিন্তু বড় পরে সুনয়নী, বড় দেরীতে। আর হয় না।

গাড়িটাকে একটা মোড় ঘোরালো জয়দ্রথ, আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন চন্দ্রকান্ত।

কখন? কখন শুরু হয়ে গেছে এ দৃশ্য?

পূবের আকাশে অনন্ত বর্ণচ্ছটা, অফুরন্ত বিস্ময়। গাড়ী চলেছে, পুব আকাশও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। এ এক আশ্চর্য রহস্য। কত কোটি কতকাল ধরে আকাশ বসে আছে পৃথিবীর শিয়রে, চলেছে পৃথিবীর সঙ্গে। আর কোটি কল্পকাল ধরেই তিমির গভীর রাত্রির তপস্যায় সঞ্চয় করে তোলা অনির্বাণ জ্যোতি, অসীম প্রাণরস প্রবাহ উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছে পৃথিবীকে পরম প্রেমে, পরম মমতায়। ক্লান্তি নেই, আলস্য নেই, বিরাগ নেই।

চন্দ্রকান্ত কোন শহরে যাচ্ছেন?

সেখানে তাঁর জন্য একটি ছোট বাসা ভাড়া করা আছে বলে? কিন্তু সমস্ত পৃথিবী জুড়েই তো বাসা। ক্ষুদ্র বৃহৎ, সুখের দুঃখের। তবে? পৃথিবীর বিশেষ একটুখানি মাটি আঁকড়ে সেই বিশেষ একটি ছোট্ট বাসার মধ্যে নিজেকে আটকে রাখবেন কেন চন্দ্রকান্ত?

জয়দ্রথ ! তোমার গাড়ি নিয়ে ফিরে যাও বাবা, আমি এখানেই নামছি।

আজ্ঞে বলেন কি ছোট কত্তা, পথ যে এখনও অনেক বাকি। ইষ্টিশনে আসতে দেরী আছে।

নাঃ জয়দ্রথ, এসে গেছে আমার ইষ্টিশান। নামতে দাও আমায়। এই নাও।

পকেটে হাত পুরে একমুঠো টাকা পয়সা বার করলেন। এগিয়ে দিলেন জয়দ্রথের দিকে।

কিন্তুক ছোটকর্তা, এ যে একেবারে ধানক্ষেত, জন মনিষ্যের চিহ্ন মাত্তর নাই।

চন্দ্রকান্ত হেসে উঠলেন।

ধানক্ষেত তো আপনি জন্মায়নি জয়দ্রথ ? জনমনিষ্যির হাত যে লেগে রয়েছে ওদের গায়ে। নামাও নামাও।

জয়দ্রথ গাড়ি নামাল। নেমে এলেন চন্দ্রকান্ত।

আছে। এখানেও সামনেই পূবের আকাশ।

পৃথিবীর কাছে কোন দিন বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না আকাশ। অকৃতজ্ঞ পৃথিবী যাই বলুক।

জয়দ্রথের গাড়ির চাকার ধুলোও ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল, চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দটা ক্ষীণ হয়েও মিলিয়ে যেতে চাইছে না। ওইটা থেমে গেলেই চলতে শুরু করবেন চন্দ্রকান্ত। মাটিতে নেমে এসে আকাশটা আরো কাছাকাছি চলে এলো কী করে ? আশ্চর্য তো !

এই অফুরন্ত আশ্চর্যের সঙ্গ রইল চন্দ্রকান্তর জন্যে। কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

শেষ